বনফুল

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ... কলিকাতা - ৬

ফোন—৩৪-১৭৪৪ গ্রাম—Publicasun, Cal.

দুই টাকা আট আনা

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ়—১৩৬১

উৎসর্গ

অগ্রজ কথাশিল্পী

শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী (মহাস্থবির)

করকমলে—

২৮।১।৫৪

ভাগলপুর

বনফুলের

আরও ছ'খানি বই

মন্ত্র-মুগ্ধ	২৲
বাহুল্য	২৲

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৬

নবমঞ্জরী

পরী

মাথার উপর পাখাটা বনবন করিয়া ঘুরিতেছিল। কুমার সুমিত্রানন্দনের অবিন্যস্ত তৈলহীন কেশরাশি হাওয়ার আবর্তে আরও অবিন্যস্ত হইয়া পড়িতেছিল। ঠিক পাশেই মর্মর-নির্মিত তেপায়ার উপর রক্ষিত সুরাপাত্রের ফেনবুদ্বুদমালাও ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িতেছিল সে হাওয়ার বেগে। কুমার সুমিত্রানন্দন কম্পিত হস্তে সুরাপাত্রটি তুলিয়া আর এক চুমুক পান করিলেন। তাহার পর সম্মুখের দেওয়ালে বিলম্বিত ছবিটির দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া রহিলেন খানিকক্ষণ। মদিরাক্ষী তরুণীর ছবি। চোখের দৃষ্টিতে স-কৌতুক হাসি ফুটিয়া রহিয়াছে। কুমার আর এক চুমুক সুরা পান করিলেন। তাঁহার বিহ্বল চোখের দৃষ্টি আবেশময় হইয়া উঠিল। ক্ষণকাল পরে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তিনি দ্বারের দিকে চাহিলেন।

কে, নিখিলবাবু না কি ?

হ্যাঁ।

স-সঙ্কোচে প্রৌঢ় ম্যানেজার নিখিলনাথ প্রবেশ করিলেন।

সব ঠিক হয়ে গেল ?

হ্যাঁ। বাড়িটা বাঁধা রাখতে হবে, তবে তিনি টাকা দেবেন বলছেন !

মাত্র এক লক্ষ টাকার জন্যে দশ লক্ষ টাকা দামের বাড়িটা বাঁধা রাখতে হবে ?

ম্যানেজার চুপ করিয়া রহিলেন।

কুছ পরোয়া নেই। কাগজপত্তর ঠিক করুন। দেরি করবেন না।

সব ঠিক ক'রে রেখেছি, আপনি সই ক'রে দিলেই হবে খালি।

বেশ, রেখে যান আপনি। আমি সই ক'রে দিচ্ছি একটু পরে। হাতটা এখন স্টেডি নেই।

দলিলটি লইয়া নিখিলনাথ বাহির হইয়া গেলেন।

পুনরায় ছবিটির দিকে চাহিয়া সুমিত্রানন্দন আপন মনে বলিলেন, তোমার দাম দশ লক্ষ টাকার চেয়েও বেশি—ঢের বেশি।

বাহিরে পদশব্দ হইল। কুমার সুমিত্রানন্দন আবার দ্বারের দিকে চাহিলেন।

নিখিলবাবু না কি?

না, আমি।

ও, বীরু! এস, এস।

বয়স্ক বীরেন্দ্রনাথ সোফায় বসিতে বসিতে বলিলেন, তোমার পরীর খবর কি?

আকাশলোক থেকে আজই নেবে আসবে মনে হচ্ছে।

মনে হওয়ার কারণ?

হীরের হারটা আজই কিনে দেব।

লক্ষ টাকা খরচ ক'রে! অত টাকা পেলে কোথা? তোমার ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স তো—

বাড়িটা বাঁধা রেখে টাকা ধার করছি।

ও।

বীরেন্দ্রনাথ স্মিতমুখে চুপ করিয়া রহিলেন। ক্রমশ তাঁহার চোখেব দৃষ্টিতেও একটি সকৌতুক হাসি ফুটিয়া উঠিল।

কুমার সুমিত্রানন্দন তাঁহার চোখের দিকে চাহিযাছিলেন। বলিলেন, তোমার মনে কিছু একটা জেগেছে বুঝতে পারছি। ব'লে ফেলো। তবে মর‍্যাল লেকচার দিও না।

বীরেন্দ্রনাথ ইতিহাসের ছাত্র।

না, মর‍্যাল লেকচার দেব না। আমি খুশিই হয়েছি।

তোমার খুশি হবার কারণ?

মানব নামক পশুর প্রগতি দেখে।

কি রকম, খুলে বল, বুঝতে পারলাম না।

সুমিত্রানন্দন আর এক চুমুক সুরাপান করিয়া বলিলেন, আমার তো ধারণা কিস্যু হয় নি। হা-হা-হা-হা—

অট্টহাস্য করিতে করিতে সহসা থামিয়া গেলেন সুমিত্রানন্দন।

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, কি রকম প্রগতি হয়েছে, শুনি।

তা হ'লে একটা গল্প শোন। আর কিছু নয়, ব্যাপারটা একটু নীট হয়েছে।

বল।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের এক রাজকুমার যে রমণীটির প্রেমে পড়েছিলেন, তাঁর অনুগ্রহ লাভ কববার জন্যে কি করেছিলেন জান ?

কি ?

দশ হাজার মানুষকে বলিদান দিয়েছিলেন।

কেন ?

তাঁর প্রেয়সীর সখ হয়েছিল লোধ্রফুলের রেণু মাখতে। তিনি বলেছিলেন লোধ্রফুলের একটি বাগান ক'রে দাও আমাকে। রাজা কিন্তু বহু চেষ্টা ক'রেও লোধ্রফুলেব একটি চাবাও বাঁচাতে পারলেন না তাঁর জমিতে। হয়তো সে জমিতে লোধ্রফুলের উপযোগী সার ছিল না। তাঁর পুরোহিত তাঁকে বললেন যে, ওই জমিতে যদি দশ হাজার মানুষ বলিদান দিতে পার, তা হ'লে লোধ্রফুলের চারা বাঁচবে। রাজার অসংখ্য দাস ছিল। পরদিনই দশ হাজার মানবপশুর রক্তে সে জমিতে কাদা হয়ে গেল। ব্যাপারটা একটু স্থূল, এই আর কি। এখনকার ব্যাপার একটু সূক্ষ্ম হয়েছে। ওই এক লক্ষ টাকা ওই মারোয়াড়ীর ব্যাঙ্কে জমেছে হয়তো দশ হাজার লোকের বুকের রক্ত শোষণ ক'রেই, কিন্তু তার প্রকাশ হয়েছে ওই হীরের হারে।

সুমিত্রানন্দনের চোখের দৃষ্টিতেও কৌতুক ঝলমল করিয়া উঠিল।

এ ব্যাপারে মানব-পশুর বলিদান দেখতে পাচ্ছ না তুমি ?

পাচ্ছি, কিন্তু সে একটিমাত্র পশুর।

সুমিত্রানন্দন হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

তাহার পর বলিলেন, লোধ্রফুল কোথায় পাওয়া যায়, দেখেছ কখনও ?

না, দেখি নি। কালিদাসের কাব্যে পড়েছি। উজ্জয়িনীর আশে-পাশেই পাওয়া যায় সম্ভবত। আমি এখন চলি ভাই, সন্ধ্যেবেলা আসব আবার।

বীরেন্দ্র চলিয়া গেলেন। সুমিত্রানন্দন পরীর ছবির দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া হাসিলেন একটু।

পরক্ষণেই ফোনটা বাজিয়া উঠিল।

কে, পরী ?···তোমার হার নিয়ে আজ যাচ্ছি সন্ধ্যের সময়···হ্যাঁ, বীরেন এখুনি এসেছিল। ভারি মজার একটা গল্প ব'লে গেল। শুনবে, ফোনটা ধ'রে থাক তা হ'লে—

সুমিত্রানন্দন গল্পটি আগাগোড়া বলিলেন। তাহার পর সহসা তাঁহার মুখভাব পরিবর্তিত হইয়া গেল।

সত্যি বলছ ? নিশ্চয়, যেমন ক'রে পারি যোগাড় করব।

ম্যানেজার নিখিলনাথ দলিলপত্র লইয়া প্রবেশ করিলেন।

নিখিলবাবু, টাকার আর দরকার নেই। আমি এখখুনি উজ্জয়িনী যাব। লোধ্রফুল যোগাড় করতে হবে। ফোন ক'রে এখখুনি বার্থ রিজার্ভ করুন।

নিখিলনাথ সবিস্ময়ে প্রভুর দিকে চাহিয়া রহিলেন।

গন্ধমূষিক শর্মার আত্মজীবনী

ঈজি-চেয়ারে শুয়ে চালের বাতা গুনছিলাম। আমি যে ঘরটিতে লেখাপড়া করি সেটির ছাদ পাকা নয়, সুতরাং কড়িকাঠ গোনবার সুযোগ নেই। অতিশয় বোকার মত আমি আশা করছিলাম যে, ওই ঘুন-ধরা চালের বাতাগুলির মধ্যেই হয়তো কোনও গল্পের প্লট পেয়ে যাব। মিনিট কয়েক পরে কিন্তু ঘরের মধ্যে একটি নূতন ঘটনা ঘটাতে আমার চিত্ত বিক্ষিপ্ত হ'ল। দৃষ্টি বা মনকে আর চালের বাতায় নিবদ্ধ রাখতে পারলাম না। কোথা থেকে একটা ছুঁচো বেরিয়ে ঘরের মধ্যে কিচকিচ ক'রে বেড়াতে লাগল। শব্দে আর গন্ধে অস্থির হয়ে উঠলাম। চেয়ারের উপর পা-টা গুটিয়ে নিলাম ভাল ক'রে। আমার বন্ধু অমর সামান্য একটা ইঁদুরের কামড়ে মর-মর 'হয়েছিল মনে পড়ল। জ্বর হয়ে বুকে সর্দি ব'সে যায় আর কি বেচারা! ছুঁচো যদি কামড়ায় না-জানি কি কাণ্ড হবে! পা-টা ভাল ক'রে গুটিয়েই বসলাম! তার পরই আবার কপাটে ঠুকঠুক ক'রে আওয়াজ আরম্ভ হ'ল! কপাটে খিল বন্ধ ছিল। ভাবলাম কি আপদ, আজ আর লিখতে দেবে না দেখছি! ঠুকঠুক্ শব্দ সমানে চলতে লাগল। ছুঁচোটাই শব্দ করছে নাকি? কিন্তু একটু পরেই বুঝতে পারলাম, ছুঁচো নয়। বাইরে থেকে কেউ কড়া নাড়ছে। উঠে কপাটটা খুলে দিলাম। খুলে যা দেখলাম, তা সত্যিই অপ্রত্যাশিত। অপরূপ সুন্দরী দাঁড়িয়ে আছেন একজন। রাত-দুপুরে কে এল এ! মিঠ্ঠু মজুমদার নামে যে মেয়েটি চিঠির পর চিঠি লিখে যাচ্ছে ক্রমাগত, সে-ই সশরীরে এসে হাজির হ'ল নাকি শেষ পর্যন্ত! আসবে ব'লে শাসিয়েছিল। মিঠ্ঠু আমার লেখার একজন ভক্ত—সে যা লেখে তার কিয়দংশও যদি সত্য হয় তা হ'লে খুব প্রগাঢ় ভক্তই বলতে হবে; কিন্তু তবু এই রাত-দুপুরে বিনা আমন্ত্রণে সে আমার দ্বারস্থ হবে এতটা বাড়াবাড়ি ভক্তি কল্পনা করতে কুণ্ঠিত হচ্ছিলাম। কিন্তু আর আমার চিন্তা বেশি দূর

অগ্রসর হতে পেল না। মহিলাটি সহাস্য দৃষ্টি তুলে নিজেই বললেন, অনেকক্ষণ থেকে কাতরভাবে ডাকছ, তাই এলাম।

অনেকক্ষণ থেকে তো মোধো চাকরকে ডাকছি এক পেয়ালা কফি দিয়ে যাবার জন্যে! আর কাউকে ডেকেছি ব'লে তো মনে পড়ল না।

সভয়ে প্রশ্ন করলাম, কে আপনি?

আমি সরস্বতী। আমি আরও বিশেষ ক'রে এলাম আর একটা কারণে। এই পূজোর হিড়িকে তোমরা অনেকেই যা-তা লিখছ। তাই ঠিক করেছি, তোমাদের লেখাগুলো একবার দেখে দেব। চল—

সরস্বতী দেবী ঘরে এসে ঢুকলেন এবং ঘরের এক কোণে একটা চেয়ারে গিয়ে বসলেন। আমার দিকে চেয়ে বললেন, আমার জন্যে তোমায় কিছু ব্যস্ত হতে হবে না। তুমি আপন মনে যা লিখতে চাও লিখে ফেল। লেখাটা শেষ হ'লে দেখে আমি ব'লে দেব, ছাপাবার উপযুক্ত হয়েছে কি না!

তার পর আমার দিকে চেয়ে একটু হেসে বললেন, আমি চেয়ারটা আর একটু কোণের দিকে নিয়ে যাচ্ছি। আমি সামনে ব'সে থাকলে হয়তো অন্যমনস্ক হয়ে পড়বে।

চেয়ারটা টেনে তিনি অন্ধকার কোণটায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আমি যে কি করব, কি বলব—কিছুই ভেবে পেলাম না। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম, তার পর নিজের চেয়ারটাতে গিয়ে বসলাম।

যে ছুঁচোটা কিচকিচ ক'রে ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছিল, তার শব্দটা বন্ধ হয়ে গেল হঠাৎ। গন্ধটা কিন্তু গেল না, বরং মনে হ'ল, সেটা যেন আরও নিবিড় হয়ে উঠেছে। তার পরই দেখতে পেলাম, ছুঁচোটা আমার টেবিলের উপর উঠে পিছনের দুই পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে আর সামনের পা দুটো জোড় ক'রে আমার দিকে চাইছে। ঠিক মনে হ'ল, যেন কোন প্রার্থী হাতজোড় ক'রে প্রার্থনা করছে কিছু। অদ্ভুত কাণ্ড! পর-মুহূর্তে যা হ'ল, তা আরও অদ্ভুত। মানুষের ভাষায় কথা কইতে আরম্ভ করলে সে।

বলতে লাগল, আমি ছুঁচো নই, ছুঁচী। আমি সুবিখ্যাত গন্ধমুষিক শর্মার

কনিষ্ঠা পত্নী কস্তুরী দেবী। ছুঁচো-সমাজে তিনিই প্রথম বিদ্রোহী, তিনিই প্রথম পৈতে নিয়েছেন, তিনিই প্রথম রাজনৈতিক আন্দোলন করেছেন, তিনিই প্রথম সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। এতবড় একজন মহাপুরুষের মহজ্জীবনী কি আপনারা প্রচার করবেন না? শুনেছি, আপনারা সুন্দরের উপাসক, মহানের পূজারী—

বিস্ময় সীমা অতিক্রম করেছিল। তবু যথাসম্ভব গাম্ভীর্য রক্ষা ক'রে বললাম, যা শুনেছেন তা ঠিক। শ্রীযুক্ত গন্ধমুষিক শর্মার জীবনীর উপকরণ যদি পাই, তা হ'লে তা নিশ্চয়ই ব্যবহার করব। কিন্তু উপকরণ পাব কোথা? আপনি সরবরাহ করবেন কি?

শ্রীমতী কস্তুরী মুচকি হেসে বললেন, (বিশ্বাস করুন, ছুঁচীর ছুঁচলো মুখের মুচকি হাসি সত্যই মনোরম) আমি তাঁর জীবনের কতটুকু আর জানি! মাত্র দিন কুড়ি আগে তো ওঁর কাছে এসেছি। আমার আগে উনি অন্তত শ দুই ছুঁচীকে নিয়ে ঘর করেছেন। তারা হয়তো অনেক কিছু উপকরণ দিতে পারত আপনাকে। কিন্তু তাঁদের সে সব খেয়ালই হয় নি। আমি আধুনিকা, এসেই বুঝেছি যে উনি সাধারণ ছুঁচো নন, ওঁর জীবনী জনসমাজে প্রচার না করলে জনসমাজের প্রতিই অবিচার করা হবে।

কিন্তু সে জীবনীর উপকরণ পাই কি ক'রে?

উনি নিজেই বলবেন আপনাকে। প্রথম প্রথম উনি রাজী হচ্ছিলেন না। বলছিলেন—নিজের কথা, বিশেষ ক'রে নিজের প্রশংসা কি নিজের মুখে বলাটা ভাল দেখাবে? আমি তখন নজীর দেখালাম, কত বড় বড় লোক এ যুগে আত্মজীবনী লিখছেন। বর্তমান যুগে ওইটেই ফ্যাশন। ওতে দোষের কিছু নেই।

উনি রাজী হয়েছেন?

অনেক কষ্টে রাজী করিয়েছি। উনি যদি সব খুলে বলেন, তা হ'লে দেখবেন, কি অদ্ভুত ওঁর জীবন! অনেক বড়লোক শুনেছি নিজের শৈশব-

জীবন বা কৈশোর-জীবন থেকে আত্মচরিত শুরু করেন। শ্রীযুক্ত গন্ধমূষিক যদি ইচ্ছে করেন, তা হ'লে নিজের পূর্বজীবন থেকেই আরম্ভ করতে পারেন। কারণ পূর্বজীবনেরও প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি ওঁর চমৎকার মনে আছে। ওঁর বর্তমান-জীবনও রোমাঞ্চকর। কি ক'রে একবার একটা নিষ্ঠুর সাপ ওঁকে প্রায় গিলে ফেলেছিল, কি ভাবে একবার এক গৃহস্থের 'মীট-সেফে' উনি বন্দী হয়েছিলেন, প্রকাণ্ড একটা দুধের কড়ায় প'ড়ে গিয়ে কি ক'রে হাবুডুবু খেতে খেতে শেষে উনি বাঁচেন—এ সব ঘটনা লিপিবদ্ধ করবার মত। উনি যদি প্রাণ খুলে সব বলেন আর আপনি যদি ভাল ক'রে লিখতে পারেন, আপনাদের সমাজে হৈ-হৈ প'ড়ে যাবে দেখবেন। ওঁর যৌবন-জীবনও অনবদ্য। সবটা বোধ হয় খুলে বলবেন না উনি। কিন্তু একটুও যদি বলেন, দেখবেন, কি দুর্দমই না ছিল ওঁর যৌবন! এখনও তার বেশ আছে। আশা করি, এটাকে আপনি নিছক যৌন-লালসা ব'লে ভুল করবেন না। এর মধ্যে প্রাণপ্রবাহের যে অস্থির চঞ্চলতা আছে তা আপনার মত রসিকের দৃষ্টি এড়িয়ে যাবে না আশা করি। আর একটা জিনিসও আপনাকে ব'লে দিচ্ছি। ওঁর গলায় দেখবেন পৈতে রয়েছে, ওঁকে জিজ্ঞেস করলে উনি বলবেন যে, একবার একটা জালে নাকি আটকে পড়েছিলেন. সেই জাল কেটে যখন পালিয়ে আসেন তখন ওই সুতোটুকু নাকি ওঁর গলায় আটকে থেকে গিয়েছিল। এই মিথ্যাভাষণটুকু উনি করেন, কারণ উনি নিজের আধ্যাত্মিক জীবনের নিগূঢ় ইতিহাস প্রকাশ করতে চান না। আপনি কিন্তু বিশ্বাস করবেন না এ কথা, বুঝলেন।

ক্রমশই আমি কেমন যেন সম্মোহিত হয়ে পড়েছিলাম। বললাম, বেশ, নিয়ে আসুন তাঁকে।

আমার টেবিলের উপর ছোট যে বইয়ের শেল্ফ্‌টা ছিল, শ্রীমতী কস্তুরী দেবী তার পাশে অন্তর্হিত হলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হাজির হলেন শ্রীযুক্ত গন্ধমূষিক শর্মা। বেশ কেঁদো ছুঁচো একটি। তিনিও এসে পিছনের পা দুটিতে ভর দিয়ে দাঁড়ালেন এবং সামনের পা দুটি বুকের কাছে জোড় ক'রে মিটমিট ক'রে চাইতে লাগলেন আমার দিকে। গলার সুতোটি দেখতে পেলাম। আরও দেখলাম

তাঁর একটি কান একটু মোড়া, গায়ের লোমও উঠে গেছে মাঝে মাঝে, মুখটা খুব বেশি ছুঁচলো নয়, একটু যেন ভোঁতা হয়ে গেছে।

বললাম, নমস্কার, আপনার আত্মজীবনী শুনব ব'লে অপেক্ষা করছি।

ক্ষণকাল ইতস্তত ক'রে গন্ধমূষিক বললেন, আমি ছুঁচো।

ব'লেই থেমে গেলেন তিনি। আমি আরও কিছু শোনবার আশায় চুপ ক'রে রইলাম। কিন্তু গন্ধমূষিক আর কিছু না ব'লে এদিক ওদিক চাইতে লাগলেন শুধু।

বললাম, বলুন।

আজ্ঞে, আমি ছুঁচো।

আবার থেমে গেলেন।

হ্যাঁ, বলুন।

আজ্ঞে, আমি ছুঁচো ছাড়া আর কিছু নই।

ব'লেই তিনি পট্ ক'রে শেল্ফের পাশে অন্তর্ধান করলেন। পর-মুহূর্তেই টেবিলের নীচে আবার কিচকিচ শব্দ শুনতে পেলাম, মনে হ'ল, কলহ শুরু হয়েছে। ক্ষণকাল প'রে তাও থেমে গেল।

উপরোক্ত ঘটনাটি লিপিবদ্ধ ক'রে চুপ ক'রে ব'সে আছি, এমন সময় অন্ধকার কোণ থেকে দেবী সরস্বতী আবির্ভূতা হলেন আবার।

কই, দেখি?

খাতাখানা এগিয়ে দিলাম। পড়তে পড়তে তাঁর মুখে মৃদুহাস্য ফুটে উঠল একটা। খাতাখানা ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, ছাপতে দিতে পার।

ছাপতে দেব? কি আছে ওতে?

একটা জিনিস অন্তত আছে।

কি?

শ্রীযুক্ত গন্ধেশ্বর শর্মা তাঁর আত্মজীবনীটি বেশ সংক্ষেপে বলেছেন। সমস্ত বক্তব্যটা খুব কম কথায় গুছিয়ে বলা মস্ত বড় একটা আর্ট। উনি যে একটি ছুঁচো ছাড়া আর কিছু নন—এই কথাটাই উনি ভ্যানর ভ্যানর ক'রে দশ হাজার পাতাতেও বলতে পারতেন ; কিন্তু সে লোভ উনি সংবরণ করেছেন। আচ্ছা, আমি চললুম।

দেবী অন্তর্হিতা হলেন। আমি চুপ ক'রে ব'সে রইলাম।

দুই নারী

আমাদের মধ্যে যে পশুটা সর্বক্ষণ উদ্যত হয়ে থাকে, সেই পশুটাকে দমন ক'রে রাখবার শিক্ষা ভাগ্যক্রমে আমি পেয়েছিলাম ব'লে প্রথমবার বেঁচে গিয়েছিলাম। তখন আমি বি, এ, পাস করেছি। ভর্তি হয়েছি এম, এ, ক্লাসে। আমার দূর-সম্পর্কের এক দাদা তখন তিনপাহাড়ে ছিলেন। পুজোর ছুটিতে তাঁর কাছে বেড়াতে গিয়েছিলাম। আমার দেহ-মনে তখন দুর্বার যৌবন প্রতি মুহূর্তে বাঁধ ভাঙবার চেষ্টা করছে। আর আমি প্রাণপণে চেষ্টা করছি সে বাঁধকে দৃঢ় করবার। অশ্বিনী দত্তের 'ভক্তিযোগ' সর্বদা সঙ্গে থাকে। শান্তিশতকের সেই শ্লোকটা প্রায়ই আওড়াই মনে মনে, যার অর্থ—যে যুবতীটি একদিন কত মোহের জাল বিস্তার করেছিল, চেয়ে দেখ এখন সে শ্মশানে। খট্টাঙ্গের একপ্রান্তে তার মাথার খুলিটা প'ড়ে আছে, দাঁত বেরিয়ে রয়েছে, শ্মশানের হাওয়া হু-হু ক'রে তার মধ্যে ঢুকছে আর বেরুচ্ছে। সে হাওয়া সবাইকে ডেকে যেন বলছে—কোথায় সেই মুখপদ্ম, কোথায় সেই অধর-মধু, কোথায় সেই বিশাল কটাক্ষ? কোথায় গেল কোমল আলাপ, মদনধনুর মত কুটিল ভ্রূবিলাস? কোথায় সে সব এখন? যোগোপনিষদে শুকদেব যা বলেছেন তা স্মরণ করি রোজ, এই শরীর ব্রণমুখ, দুর্গন্ধ-চর্ম-জড়িত, শত শত কৃমিপূর্ণ, মূত্রবিষ্ঠালিপ্ত, পরিবর্তনশীল, সর্বভোগের বাসস্থান, মরণের কারণ···। মনের যখন এই অবস্থা তখন তিনপাহাড়ে গেলাম। দাদার ঠিক মাস ছয়েক আগে বিয়ে হয়েছিল। বউদিকে সেই প্রথম দেখলাম আমি। আমাকেও বউদি দেখলেন। দুজনেই দুজনের দিকে চেয়ে নির্নিমেষ হয়ে গেলাম কয়েক মুহূর্তের জন্য। বউদিকে রূপসী বললে কিছুই বলা হয় না, পরমাসুন্দরী বললেও না, ঠিক কি বললে যে তাঁর রূপটি বোঝানো যায় তা আজও ঠিক করতে পারি নি আমি। তাঁকে দেখে একটিমাত্র কথা আমার মনে হয়েছিল, সে কথাটি হচ্ছে 'চুম্বক'।

শিকারী খেলোয়াড় বড় মাছকে বঁড়শিতে গেঁথে অনেকক্ষণ খেলিয়ে তারপর যেমন টেনে তোলে, টেনে তোলবার আগে আমাকেও তেমনি খেলাচ্ছিলেন বউদি দৃষ্টির বঁড়শিতে গেঁথে। যখনই তাঁর দিকে চাইতাম, চোখাচোখি হয়ে যেত। মনে হ'ত, আমি যখন তাঁকে দেখছি না তখনও যেন তিনি চেয়ে আছেন আমার দিকে। পিঠের কাছে অস্বস্তি বোধ করতাম একটা। ঘাড় ফিরিয়ে চাইলেই চোখাচোখি হয়ে যেত, বউদির মুখে ফুটত মুচকি হাসি।

আমার যতীনদা ছিলেন শিবটি। বউদিদির এই সব চটুলতা তিনি লক্ষ্য করেছিলেন কি না জানি না, কিন্তু লক্ষ্য করলে সদ্য-বিবাহিত স্বামীর অন্তরে যা যা হওয়া স্বাভাবিক তা তাঁর হয় নি। তার কোনও লক্ষণ অন্তত দেখি নি। তিনি বেশ প্রসন্ন মনে ভোরে উঠতেন, স্নান করতেন, পূজো করতেন, সকাল সকাল খেয়ে আপিসে চ'লে যেতেন। মাঝে মাঝে বউদির দিকে চেয়ে প্রসন্ন হাসি হেসে বলতেন, তোমারই মজা হয়েছে দেখছি। একা একা কি করবে ভেবে পেতে না, মণ্টু আসাতে বেশ একটি সঙ্গী জুটে গেছে তোমার। একদিন যাও না দুজনে, মতিঝরনায় বেড়িয়ে এস।

আমি কিন্তু বউদিদির ব্যবহারে বিব্রত হয়ে পড়ছিলাম। খুব ভোরে এসে আমার ঘরে ঢুকে আমার গায়ে হাত দিয়ে আমাকে ঠেলে ঠেলে ওঠাতেন তিনি।

ওঠ ওঠ, কত বেলা পর্যন্ত ঘুমুবে! চা যে জুড়িয়ে গেল—

ঘুমের ঘোরে কাপড়-চোপড় সব সময় ঠিক থাকত না, বিব্রত হয়ে উঠে বসতাম। বউদি মুচকি হেসে বলতেন, আহা, বেচারী! সারারাত একলাটি শুয়ে থাকতে কষ্ট হয় নিশ্চয়। একটেরে ঘর তো—

একদিন দুপুরবেলা ব'সে তেল মাখছি, বউদি একটা মোড়ায় এসে বসলেন উঠোনে। আমার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন, তুমি বোধ হয় একসারসাইজ কর, নয়?

কুস্তি করি।

কার সঙ্গে?

আমাদের আখড়ার লোকের সঙ্গে।

এখানে কুস্তি করবার লোক পাচ্ছ না বুঝি! এখানে কে তোমার মত অসুরের সঙ্গে লড়বে, বল! ও কি, হয়ে গেল তেল-মাখা? পিঠটাতে তো কিছুই হ'ল না! দেব মাখিয়ে?

না না, থাক্।

বউদি শুনলেন না। উঠে এলেন, আমার মানা করা সত্ত্বেও আমার পিঠে তেল মাখাতে লাগলেন। মুচকি হেসে বললেন, পুরুষ মানুষের অত লজ্জা কিসের?

নির্বাক হয়ে রইলাম। ঠিক করলাম, সেই দিনই স'রে পড়ব। 'ভক্তিযোগে'র অশ্বিনী দত্ত সেই পরামর্শই দিতে লাগলেন আমাকে। যাওয়া কিন্তু হ'ল না। যতীনদা আপিস থেকে এসে বললেন, কাল তোমরা মতি ঝরনা ঘুরে এস, ট্রলি ঠিক করেছি।

যতীনদা রেলের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে কি একটা কাজ করতেন। ট্রলি এসে হাজির হ'ল তার পরদিন ভোরে। যতীনদা যেতে পারলেন না, তাঁর আপিস ছিল। বউদিকে নিয়ে আমিই গেলাম। যেতে হ'ল। রেল থেকে কিছু দূরে মতিঝরনা। বেশ খানিকটা হেঁটে যেতে হয়। গিয়ে যখন হাজির হলাম, মনে হ'ল, না এলে ঠকতাম। অদ্ভুত দৃশ্য। অদ্ভুত নির্জনতা। মনে হ'ল, অন্য একটা জগতে এসেছি। একটা কুলি আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছিল। সে বললে, আমি হুজুর খাবার নিয়ে আসি। আপনারা স্নান করেন তো ক'রে নিন।

বউদিদি কাপড়-গামছা এনেছিলেন। শুধু নিজের নয়, আমারও। আমি বললাম, আমি স্নান করব না। শরীরটা ভাল নেই।

আমি কিন্তু করব।—মুচকি হেসে বউদিদি বললেন।

কুলিটা চ'লে গেল। আমি দূরে একটা পাথরের ওপর ব'সে রইলাম। বউদিদি স্নান করতে লাগলেন। তাঁর স্নানলীলা অবর্ণনীয়। প্রতিজ্ঞা করলাম, ফিরে এসে রাত্রের ট্রেনেই চ'লে যাব।

যাওয়া কিন্তু হ'ল না। যতীনদাই বাধা দিলেন। বললেন, আজ আমাদের এখানে যাত্রা হবে। আজ যাত্রাটা দেখে কাল যেও।

কত রাত হয়েছিল জানি না। যাত্রা দেখছিলাম ব'সে ব'সে। খানিকক্ষণ পরে কিন্তু আর ভাল লাগল না। ঘুম পেতে লাগল। উঠে এলাম। বাইরের ঘরে আমার বিছানা পাতাই ছিল, এসে শুয়ে পড়লাম। ঠিক তন্দ্রাটি এসেছে, খুট ক'রে শব্দ হ'ল একটা। ঘরে কেউ এসেছে না কি? পর-মুহূর্তেই আমার হাতটা চেপে ধরলেন বউদি! উষ্ণ স্পর্শ!

কে?

কোন উত্তর নেই।

আমি তড়াক ক'রে বিছানা থেকে নেমে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম। ভোরেই একটা ট্রেন ছিল, সেই ট্রেনেই ত্যাগ করলাম তিনপাহাড়।

২

চ'লে এলাম বটে, কিন্তু স্বস্তি পেলাম না। সেই উষ্ণ স্পর্শটাও আমার সঙ্গে সঙ্গে এল। আমার সংযমের হিমালয় গলতে লাগল ধীরে ধীরে। তার পর নূতন বইও পড়লাম কয়েকটা পর পর। 'নষ্টনীড়', 'নানা', 'লেডি চ্যাটার্লিজ লাভার', 'মাস্টার প্যাশন', 'রেনস্'। দৃষ্টিভঙ্গী বদলাতে লাগল। মনে হতে লাগল 'ভক্তিযোগ' আর 'গীতা'র রসাস্বাদন করবার যোগ্যই হই নি আমি। রাজসিক জীবন যাপন না করলে আধ্যাত্মিকতার প্রকৃত মর্ম বোঝা যায় না। আগে ভোগ, তার পর ত্যাগ। পিপাসা না পেলে কখনও শীতল জলের মূল্য বুঝতে পারে কেউ? ইংরেজী বাংলা দু রকম 'ওমর খৈয়াম' কিনে ফেললাম। রবীন্দ্রনাথের গানগুলোর নূতন অর্থ প্রতিভাত হ'ল মনে। আদ্যোপান্ত প'ড়ে ফেললাম, বায়রন কীটস শেলী বার্নস্। মনে হ'ল, জীবনের ঐশ্বর্যকে ত্যাগ ক'রে কোন মরুভূমির দিকে

ছুটছি আমি। অনুতাপ হতে লাগল। আমি শুকদেব নই, পাথরও নই, আমি উর্বশীকে প্রত্যাখ্যান করতে গেলাম কেন? উর্বশী তো জীবনে বার বার আসে না, একবার এসেছিল' আর আসবে কি? কবিতা লিখতে শুরু করলাম। কাগজে সেগুলো ছাপাও হতে লাগল। অনেকগুলো কাগজ বউদিকে পাঠিয়েও দিলাম। আশা করতে লাগলাম, উত্তর আসবে একটা। নিশ্চয়ই আসবে। উষ্ণ স্পর্শটা উষ্ণতর হতে লাগল প্রতিদিন। উত্তর কিন্তু এল না। তার পর আর একটা বই হাতে এল। বেট্সের লেখা কয়েকটা গল্প। মনে হ'ল, এই তো জীবনের স্বরূপ। এস্থারের ছবিটা আঁকা হয়ে গেল মানসপটে। ছলনাময়ী নারী উদ্দাম পুরুষকে যুগে যুগে আমন্ত্রণ করেছে, উদ্দাম পুরুষ যুগে যুগে বাঁধা পড়েছে তার আলিঙ্গন-পাশে। এই নিয়ম। আমি সে নিয়মের ব্যতিক্রম হব কেন? অনুতাপ হতে লাগল— হায়, হায়, কি সুযোগই হারিয়েছি!

৩

সুযোগ কিন্তু পেলাম আর একবার। বছর দুই পরে। যতীনদা তখন জামালপুরে। তিনিই আমন্ত্রণ করলেন আবার। গিয়ে যখন পঁছলাম, তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। বউদি আমাকে দেখে মুচকি হাসলেন একটু। যতীনদা বললেন, আমি ভেবেছিলাম তুমি সকালের ট্রেনে আসবে। তা ভালই হ'ল। লাইন খারাপ হয়েছে, আমাকে বেরুতে হবে এখুনি। অমিতাকে আর একা থাকতে হ'ল না, আমি একটা কুলিকে রেখে যাব ভাবছিলাম।

যতীনদা চ'লে গেলেন। মুচকি মুচকি হেসে বউদি আমায় খাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। গরম গরম ফুলকো লুচি আর ডিমের ডালনা। খাওয়া শেষ হ'লে বিছানা পেতে দিয়ে বললেন, সমস্ত দিন ট্রেনে এসেছ, শুয়ে পড়।

ঘুম পায় নি। ব'স না তুমি এইখানটায়। আমার কবিতাগুলো পড়েছিলে?

পড়েছি। কিন্তু যার উদ্দেশ্যে তুমি ওগুলো লিখেছিলে সে চ'লে গেছে!

চ'লে গেছে ?

ম'রে গেছে।

তার মানে ?

তোমার দাদাটিকে চেন না ? অমন পরশপাথরের কাছে লোহা কতক্ষণ লোহা থাকতে পারে বল ? সোনা তাকে হতেই হবে। দেখলে না কেমন বিশ্বাস ক'রে নির্ভয়ে চ'লে গেলেন ? আমি আর সে নেই, আমি অন্য মানুষ হয়ে গেছি। ঘুমোও। পাখাটা খুলে দিচ্ছি।

পাখাটা খুলে কপাটটা বন্ধ ক'রে বউদি চ'লে গেলেন।

আমি নির্বাক হ'য়ে ব'সে রইলাম। পাখাটা বনবন ক'রে ঘুরতে লাগল।

নুড়ি ও তালগাছ

বিরাট প্রান্তর। তার মাঝখানে একা দাঁড়িয়ে আছে প্রকাণ্ড এক তালগাছ। কতদিন থেকে কেউ জানে না। আশে-পাশে কোনো গাছ নাই। চতুর্দ্দিকে কেবল মাঠ আর মাঠ, দিগন্তরেখা পর্য্যন্ত বিশাল একটা বিস্তৃতি কেবল।

"তালগাছের ঠিক নীচে প'ড়ে আছে, ছোট একটি পাথরের নুড়ি। কতদিন থেকে তা-ও কেউ জানে না। আশে-পাশে তার ছোট-ছোট ঘাস। নুড়ির যতদূর স্মরণ হয়, এই ঘাস ছাড়া আর কিছুই সে দেখে নি। বর্ষাকালে গজায়, গ্রীষ্মকালে শুকিয়ে যায়। ফের্ বর্ষা এলে আবার জেগে ওঠে, জড়িয়ে ধরে তাকে শ্যামল স্নেহ-ভরে। চিরকালই সে এই দেখেছে। মাটিতে ঘাস হয়, শুকিয়ে যায়, আবার হয়। এই তার অভিজ্ঞতা। মাঝে-মাঝে তার মনে হয়, আমার দৃষ্টির বাইরে আরও কিছু ঘটে না-কি অন্যরকম ?

হঠাৎ একদিন সে তালগাছটার সম্বন্ধে সচেতন হ'লো।

এই কালো মোটা জিনিসটা কি বস্তু। সোজা উপর দিকে উঠে গেছে। যতদূর মনে পড়ে, একে একই রকম দেখছে সে চিরকাল। ঋজু···বলিষ্ঠ ···ঊর্দ্ধমুখী।

—"শুনছেন ?"

তালগাছ নিরুত্তর।

—"শুনছেন ?"

কোনো উত্তর নেই।

পাথরের নুড়ি ছোট, কিন্তু ' নাছোড়বান্দা। বহুবার ডেকে-ডেকে তালগাছকে অবশেষে বিচলিত করলে সে।

—"কি বলছ, কে তুমি ?"

—"আমি আপনার পায়ের তলায় প'ড়ে আছি, ছোট পাথরের নুড়ি। আপনি কে?"

—"আমি তালগাছ।"

—"ও!"

যদিও তালগাছের তলাতেই সে প'ড়ে আছে এত কাল, তবু তালগাছের নাম শোনেনি সে। একটু অবাক হ'লো। সোজা উঠে গেছে কত উঁচুতে! হঠাৎ মনে হ'লো, ওর অভিজ্ঞতা হয়তো নূতন রকম। একটু থেমে প্রশ্ন করলে:

—"আচ্ছা, আপনি অত উঁচুতে কি দেখেন রোজ?"

—"আকাশে সূর্য্য ওঠে আর অস্ত যায়।"

—"তারপর?"

—"আবার ওঠে"...

—

মাছ ধরা সম্বন্ধে গল্প হচ্ছিল। রিমঝিম করে বৃষ্টি পড়ছিল বাইরে। এক প্রস্থ চা নিমকি হয়ে গেছে, প্রবীন মৎস্য শিকারী বিপিন বোস তাঁর প্রাত্যহিক হুইস্কি-সোডাটি ধীরে ধীরে "সিপ" করছেন, গলির ভিতর লোক চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ, নিবিড় অন্ধকার থমথম করছে চতুর্দ্দিকে। গল্প জমাবার মতো পারিপার্শ্বিক সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু গল্প জমছিল না ঠিক।

সান্ধ্য বৈঠকটি বসেছিল কানুবাবুকে কেন্দ্র ক'রে। কানুবাবু গয়া-নিবাসী এবং ও অঞ্চলের একজন নামজাদা মৎস্য-শিকারী। তিনি এসেছিলেন তাঁর ভগ্নীপতি অতুলের কাছে। অতুল বিপিন বোসের সাকরেদ। বিপিন বোস যখনই মাছ ধরতে বেরোন অতুল তাঁর তলপি-তলপা বহন করে। তাঁর পাশে একটা ছিপ নিয়ে বসেও প্রত্যেকবার। পুটি-মাছ, ন্যাটা মাছ, বাটা মাছ ধরেওছে অনেকবার। কিন্তু যা তার স্বপ্ন তা তখনও অগাধ জলের তলায়। বড় মাছ একটাও ধরতে পারেনি বেচারি।

এক্ষেত্রে যা চিরকাল হয় তাই হচ্ছিল। অতুলচন্দ্র তার নামজাদা ভগ্নীপতি কানুবাবুর কাছে সালঙ্কারে বর্ণনা করছিল কিভাবে একবার একটা দশ-সেরি রুই 'একটু'র জন্যে ফসকে গিয়েছিল তার ছিপ থেকে।

"মাইরি বলছি, প্রায় টেনে তুলেছিলাম, পট করে সুতোটা গেল ছিঁড়ে। বিপিনদাকে জিগ্যেস করুন—" বিপিন বোস স্মিতমুখে মাথা নাড়লেন। বাইরের লোকের কাছে নিজের শিষ্যকে খেলো করবার লোক তিনি নন।

"প্রায় দশসেরের হবে মাছটা, নয় বিপিন দা ?"

"বেশী"

কানুবাবু তাঁর কাঁচা-পাকা ফ্রেঞ্চকাট দাড়ির সুচালো অংশটি পাকাতে পাকাতে বললেন, "আসল জিনিষ হচ্ছে টোপ। টোপটি যদি মুখরোচক হয়

মাছ হ্যাঁচকা টান মারবেই না। গলায় বঁড়শি বেঁধা সত্ত্বেও মারবে না, এই হচ্ছে আমার অভিজ্ঞতা” বিপিন বোস খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন কানুবাবুর মুখের দিকে, তারপর একমুখ হেসে সমর্থন কবলেন কথাটা।

“তাতে আর সন্দেহ আছে ? আমারও অভিজ্ঞতা তাই। কি ধরণেব টোপ আপনি ব্যবহার করেন।”

“আমি নানাবকম টোপ ব্যবহার করি। কেঁচো, গুগলি, ছোট কাঁকড়া বোলতার চাক। কিন্তু আমি আর একটি জিনিষ কবি ! ”

খুব রহস্যময়ভাবে দাড়ির ডগাটি পাকাতে লাগলেন কানুবাবু।

“আর কি করেন ?”

“আমি বেশ কবে’ আচার মাখিযে নি’ তাতে ?”

“আচার ?”

“আজ্ঞে হ্যাঁ। পুরোনো আমেব আচাব। ব্যবহাব কবে’ দেখবেন, খুব ভাল ফল হয়।” বিপিন বোস গম্ভীব হযে গেলেন ক্ষণকালেব জন্য। অতুল চকিতে একবাব চেযে দেখলে তাঁব মুখেব দিকে। মাছ-ধবা সম্বন্ধে বিপিন বোসকে নূতন কথা শেখাবে এমন লোক জন্মায নি, অতুলেব এই ধারণা। কানুবাবুব আচারেব কথা শুনে বেচাবা একটু অপ্রতিভ হযে পড়ল মনে মনে। বিপিন বোস কিন্তু সামলে নিলেন। বললেন, “খোট্টাব দেশের মাছেবা আচাব দেখে ভুলে যেতে পাবে, এদেশেব মাছেবা ভুলবে না। আমাব একটা কি ধাবণা হযেছে জানেন ? পাবিপার্শ্বিক আবহাওযা অনুসাবে মাছেদেবও স্বভাব বদলায, রুচি বদলায। আমাব জীবনে একবাব নয, দু’দুবাব প্রমাণ পেয়েছি এর।”

“কি বকম ?”

“আমি তখন ইনকমট্যাক্স অফিসাব। ববাববই তো মাছধবাব বাতিক, যেখানে যখন গেছি খবর নিয়েছি কোন পুকুবে মাছ আছে। একবার খবব পেলাম শ্রীকৃষ্ণপুরের জমিদার গোঁসাইজিব পুকুবে মাছ আছে অনেক। কিন্তু কাউকে তিনি পুকুরে ছিপ ফেলতে দেন না। কিন্তু আমি ইনকমট্যাকস্

অফিসার আমাকে 'না বলা শক্ত। খবর পাঠাতেই সাদরে আহ্বান করলেন। গেলাম এক রবিবারে। গিয়ে দেখি বিরাট পুকুর। পুকুর নয় তো যমুনা যেন। টলমল করছে কালো জল। পুকুরের পাড়েই রাধাবল্লভজীর প্রকাণ্ড মন্দির। নানারকম চার আর টোপ নিয়ে গিয়েছিলাম, বাগিয়ে ছিপটি ফেললাম। ও মশাই, আধঘণ্টা একঘণ্টা, দেড়ঘণ্টা কেটে গেল একটি মাছ ঠোকরাল না। আশেপাশে বড় বড় রুই কাৎলা ঘুরছে বুঝতে পারছি, কিন্তু টোপের কাছাকাছি এসেই মুখ ঘুরিয়ে চলে যাচ্ছে। কেঁচো, কাঁকড়ার বাচ্ছা, মাছের নাড়িভুড়ি, মাংসের কিমা—সব আমার সঙ্গে ছিল। একের পর এক টোপ বদলাতে লাগলাম কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা, একটি মাছ ঠোকরাল না। সমস্ত দুপুর রোদে ঠায় বসে রইলাম, কিছু হল না। অথচ মাছ প্রচুর। ঠিক করলাম আর একদিন আসব। মন্দিরের একটা রোগা গোছের চাকর ছিল। তাকে কিছু বখশিস দিলাম, আর বললাম—আসছে রবিবারে সকাল থেকেই চার ফেলে রাখিস। আমি দুপুরের দিকে আসব। চাকরটা এদিক ওদিক চেয়ে চুপি চুপি আমাকে বললে—হুজুর, এবার কিছু মালপো সঙ্গে করে আনবেন। এ পুকুরের মাছ কেঁচো টেচো খায় না, কোনরকম আমিষ খায় না। রাধাবল্লভজীর পুকুরের মাছ কি না। তাছাড়া এ বাড়ির সবাই বৈষ্ণব, মাছ মাংসের পাটই নেই—। অবাক হয়ে বললাম—মালপো খাবে? তুই জানলি কি করে? মুচকি হেসে সে বললে—আমি মাঝে মাঝে রাত্রে লুকিয়ে ধরি যে। কাউকে বলবেন না যেন হুজুর। আসছে রবিবার মালপো নিয়ে আসবেন গপগপ করে খাবে দেখবেন। তাই হল। পরের রবিবার মালপো টোপ ফেলে চারটি বড় বড় বৈষ্ণব রুই কাৎলা গেঁথে নিয়ে এলাম।"

এতক্ষণে গল্প জমল। কানু বাবু 'থ' হয়ে গেলেন। অতুলের চোখ দুটো জলজল করে উঠল। বিপিন বোস হুইস্কি-সোডায় আর একটি 'সিপ' দিলেন। কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে দ্বিতীয় গল্পটি বললেন তিনি।

"দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে লক্ষ্ণৌয়ে। লক্ষ্ণৌ শহর থেকে বেশ কিছু দূরে মফঃস্বলে ছিল পুকুরটা। কোন এক নবাবজাদার পুকুর। পুকুরের নাম

পরের রবিবার ছুটো বাইজি নিয়েই গেলাম মশাই। বললে বিশ্বাস করবেন না ঝাঁকে ঝাঁকে মাছ আসতে লাগল। ময়দার টোপ দিয়েই ধরে ফেললাম গোটা আষ্টেক কেঁদো কেঁদো মাছ। আমার বুইক গাড়ির কেরিয়ারটা ভরে গেল—"

বিপিন বোস চুপ করতেই কাহ্নবাবু ভক্তি ভরে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে বললেন, "রাত অনেক হল এবার উঠি—"

অতুলের মুখের ভাব যা হল তা অবর্ণনীয়।

ভূতের প্রেম

"এই দেখ ইন্দুর ডায়েরি। আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না, তুমি পড়ে দেখ দিকি, কিছু মানে বার করতে পার কিনা।"

বলিষ্ঠকায় ভুজঙ্গধর মরক্কো-চামড়া দিয়া বাঁধানো সুদৃশ্য খাতাখানি আমার দিকে আগাইয়া দিল।

"উনত্রিশে তারিখে যেটা লিখেছে সেইটে পড়। আরও পাতা উলটে যাও—হ্যাঁ, ওইখান থেকে পড়।"

পড়িতে লাগিলাম। ভুজঙ্গধর ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ভুজঙ্গধর আমার বাল্যবন্ধু এবং ইন্দুমতীর স্বামী।

ইন্দুমতী লিখিয়াছেন, "কাল রাত্রে যে অদ্ভুত ঘটনাটা ঘটেছে তা এতই অসম্ভব যে বললে কেউ বিশ্বাস করবে না। আমি কাউকে বলিওনি এমন কি মাণিককেও না। মাণিককে বলতে খুবই লোভ হচ্ছে, কিন্তু ভয় হচ্ছে পাছে সে আমাকে ভীতু বলে ঠাট্টা করে। তাব চক্ষে নিজেকে ভীতু প্রতিপন্ন করবার ইচ্ছে নেই। সত্যি সত্যি ভীতু আমি নইও। ভীতু হলে' জনমানব বর্জ্জিত এই পোড়ো বাড়িতে এসে থাকতেই রাজি হতাম না কি? ঘটনাটা তবু লিখে রেখেছি। লিখে রাখবার মতো ঘটনা ক'টাই বা ঘটে জীবনে! ভবিষ্যতে কোনও পাঠক বা পাঠিকা হয়তো এটা পড়ে পাগল ভাববেন আমাকে; কিংবা হয়তো কোনও উৎসাহী মনস্তাত্ত্বিক এর থেকে কোনও তথ্য উদ্ধার করে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করবেন আমার স্বামীকে। সত্যই অদ্ভুত ঘটনাটা।"

কাল রাত দশটার সময় মাণিক হঠাৎ বলল—"ওহো, একটা বড় ভুল হয়েছে, পেট্রোলটা কেনা হয়নি। চল কিনে আনি গিয়ে। দশ মাইল যেতে আসতে আর কতক্ষণ লাগবে?"

আমার শরীরটা তেমন ভাল ছিল না, কোমরটা ব্যথা করছিল সন্ধ্যে থেকেই।

তাছাড়া আগাথা ক্রিষ্টির একখানা বই এমন পেয়ে বসেছিল আমাকে যে কোথাও নড়তে ইচ্ছে করছিল না।

বললাম, "আমি আর যাব না, থাক না কাল কিনলেই হবে।"

মাণিক বললে, "ওটা হল স্ত্রীবুদ্ধি। আমরা যেরকম অবস্থায় আছি তাতে মোটরে সদাসর্ব্বদা পুরো পেট্রোল থাকা চাই।"

"তাহলে তুমিই গিয়ে নিয়ে এস।"

"তুমি থাকতে পারবে একা ? ভয় করবে না তো।"

"আমি যদি ভীতু হতাম তাহলে যা করেছি তা করতে পারতাম না কি !

মাণিক হঠাৎ ঝুঁকে আমার গালে চপাৎ করে চুম খেল একটা। এমন দুষ্টু আর অসভ্য হয়েছে আজকাল !

"আমি পেট্রোলটা নিয়ে আসি তাহলে। যাব আর আসব।"

মাণিক চলে গেল। আমরা যে বাড়িটাতে এসে ছিলাম সেটা কোন এক মৈথিল জমিদারের বাগান বাড়ি। যদিও এখন পোড়ো বাড়ির মতো হয়ে গেছে, কিন্তু একদিন যে এর মহিমা ছিল তা একনজরেই বোঝা যায়। জমিদারের বংশধর জীমূতবাহন সিংয়ের সঙ্গে মাণিকের বন্ধুত্ব আছে বলেই বাড়িটা পাওয়া সম্ভব হয়েছে। বাড়ির চাবিটা মাণিককে দিয়ে জীমূতবাহন লণ্ডনে পাড়ি দিয়েছেন সম্প্রতি। প্রকাণ্ড বাড়ি, প্রকাণ্ড হাতা। আমরা দোতলার যে ঘরখানা নিয়ে আছি, তার ঠিক সামনেই গাড়ি বারান্দা, গাড়ি-বারান্দায় বেরিয়ে দাঁড়ালেই চোখে পড়ে সুবিস্তৃত বাগানটা। বাড়ির সামনেই বাগান। এখন অবশ্য বাগানের পূর্ব্বশ্রী নেই। ফাঁকা মাঠের মতো খানিকটা জমি পড়ে আছে খালি। বাগানের ওপারে গেট। গেটেরও ভগ্নদশা। কপাট নেই, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড থাম দুটো দাঁড়িয়ে আছে কেবল।

সেদিন জ্যোৎস্না উঠেছিল খুব। ফিনিক ফুটছিল যেন চতুর্দ্দিকে। ইজি-চেয়ারটায় শুয়ে শুয়েই আমি টের পেলাম মাণিক মোটর নিয়ে বেরিয়ে গেল। তারপর কতক্ষণ কেটেছিল, আমার মনে নেই ঠিক। আমি তন্ময় হয়ে বই পড়েছিলাম। হঠাৎ শুনতে পেলাম কিসের যেন একটা শব্দ হচ্ছে। মনে হল

ঘোড়ার পায়ের শব্দ, অনেকগুলো ঘোড়া যেন টগবগ করে ছুটে আসছে। মনে হল অনেক দূর থেকে আসছে, কেন জানি না হঠাৎ মনে হল অনেকদিন ধরে আসছে! শব্দটা প্রথমে ক্ষীণ ছিল, তারপর স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। খটবট খটবট খটবট খটবট—ক্রমশই যেন এগিয়ে আসছে। আমি বইটার দিকে চেয়ে বসেছিলাম কিন্তু পড়ছিলাম না। আমি রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছিলাম। কার বা কিসের, তা জানি না, কিন্তু অপেক্ষা করছিলাম। মনে হচ্ছিল চরাচরও যেন অপেক্ষা করছে রুদ্ধশ্বাসে। কি হয় তা দেখবার জন্যে সবাই যেন উৎসুক। ছুটন্ত ঘোড়াগুলোর প্রতিটি পদক্ষেপ-ধ্বনি সবাই যেন শুনছে উৎকর্ণ হয়ে। এগিয়ে আসছিল শব্দটা···কাছে···আরও কাছে···গেট দিয়ে ঢুকল। তারপরই আমি ধড়মড় করে দাঁড়িয়ে উঠলাম। মনে হল ঘোড়াগুলো বুঝি হুড়মুড় করে' আমার ঘাড়েই লাফিয়ে পড়ল। আমি দাঁড়িয়ে ওঠামাত্র শব্দটা কিন্তু থেমে গেল হঠাৎ। হলের দরজাটা খোলা ছিল, ঘাড় ফিরিয়ে দেখি সেখানে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। প্রকাণ্ড লম্বা লোক।

"আমি তোমাকে নিতে এসেছি ইন্দুমতী।"

"কে।"

ঘরের ভিতর ঢুকল এসে। শালপ্রাংশু মহাভুজ চেহারা। মাথায় স্বর্ণমুকুট, অঙ্গে কারুকার্য্য খচিত অঙ্গচ্ছদ, কর্ণে মণিকুণ্ডল, বাহুতে কেয়ূর। চোখ দুটো যেন জ্বলজ্বল করছে। কুচকুচে কালো গোঁফ, কুচকুচে কালো কোঁকড়ানো এক মাথা চুল। আমি তো অবাক!

"কে আপনি—?"

"অয়ি মানস-সরোবর-বিহারিণী রাজহংসী, তুমি কি সত্যিই চিনতে পারচ না আমাকে!"

আমি নীচের ঠোঁটটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করে ভাবতে চেষ্টা করলাম, কোথাও একে দেখেছি কি না। সে বলতে লাগল—"একটু ভেবে দেখ মনে পড়বে। নারদের বীণাচ্যুত মালার আঘাতে আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়েছিল। কিন্তু আমি তোমাকে তো একদিনের জন্যও ভুলিনি। বারবার

এসেছি তোমার কাছে। নানারূপে এসেছি। তুমিও তো আমাকে প্রত্যাখ্যান করনি সখি। অয়ি রম্ভোরু, অয়ি অনবদ্যা ভোজনন্দিনী, ভুলে গেছ কি সব? অর্জ্জুনরূপে এসেছিলাম সুভদ্রার কাছে, পৃথ্বীরাজরূপে এসেছিলাম সংযুক্তার কাছে ···আমাকে তো তুমি প্রতিবারই চিনেছ···।"

আমি তখন আত্মস্থ হয়েছি।

বললাম, "ওসব বাজে কথা ছেড়ে দিন। স্পষ্ট করে' বলুন আপনি কে?"

"আমি অজ।"

"অজ? সে আবার কে।"

"মহারাজ রঘুর পুত্র। শ্রীরামচন্দ্রের পিতামহ—"

"কি চান আপনি—"

"তোমাকে চাই। তুমি আমার। স্বয়ংবর সভায় মলয়রাজের যে ঐশ্বর্য্য তোমাকে ক্ষণিকের জন্যও বিচলিত করেছিল তা আমি আহরণ করেছি ইন্দুমতী। অয়ি মত্ত-চকোর-লোচনে, নিতম্বগুর্ব্বি, আমিও তোমার জন্য তাম্বুললতাপরিবৃত, পূগতরুশোভিত, এলালতালিঙ্গিত, চন্দনবৃক্ষ সুরভিত, তমালমালা-আকীর্ণ মনোরম কানন নির্ম্মাণ করে রেখেছি নিষ্কলুষ মানসলোকের উত্তুঙ্গ মলয় শিখরে। চল সখি সেখানে। আমি রথ এনেছি তোমার জন্যে। চল···"

লোকটা ঘরে ঢুকে গাড়ি-বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। আমিও মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাঁর অনুসরণ করলাম। গিয়ে দেখি সত্যিই চতুরশ্ববাহিত বিরাট এক রথ দাঁড়িয়ে রয়েছে নীচে। ওরকম বলিষ্ঠ ঘোড়া আমি আর দেখিনি এর আগে। যেন মার্ব্বেল পাথর দিয়ে তৈরী!

"আর বিলম্ব কোরোনা, চল।"

লোকটা আমার হাত ধরতে যাচ্ছিল। আমি চীৎকার করে উঠলাম। মাণিকের কথা মনে পড়ল আমার!

"ভয় পেয়ো না, আমি ভদ্রবংশজাত আমি বলাৎকার করব না। যাবে না তুমি আমার সঙ্গে?"

"না—"

"কেন—"

"আমি মাণিককে ভালবাসি।"

"মাণিক? সে কে?"

"আমাদের মোটর ড্রাইভার ছিল কিছুদিন আগে। কিন্তু এখন সেই আমার সব—"

"ও। আচ্ছা আমি অপেক্ষা করব। একটা কথা শুধু বলে যাচ্ছি, আমার কাছে তোমাকে আসতেই হবে। আবার আসব আমি..."

পরমুহূর্ত্তেই সব অন্তর্হিত হয়ে গেল।

এইখানেই ডায়েরি সমাপ্ত হইয়াছে। মুখ তুলিয়া দেখিলাম ভুজঙ্গধর তখনও ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রহিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলাম—"ইন্দুকে তুমি ফিরিয়ে এনেছ?"

"হ্যাঁ, চুলের ঝুঁটি ধরে মারতে মারতে ফিরিয়ে এনেছি—"

"আর মাণিক?"

"তাকে গুলি করে ওইখানকারই একটা ইঁদারায় ফেলে দিয়েছি।"

"কি সর্ব্বনাশ!"

আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে ভুজঙ্গধর বলিল—"ইন্দুকে সত্যিই আমি ভালবাসি ভাই। ওর জন্যে ফাঁসি যেতেও আমার আপত্তি নেই।"

"এত রাত্রে তুমি আমার কাছে এসেছ কেন বল তো?"

"পরামর্শ করতে। ইন্দুকে কি লুম্বিনী পার্কে পাঠাব?

"ডায়েরিটা পড়ে মনে হচ্ছে হয়তো পাগল হয়ে গেছে?"

ঘড়িতে টং টং করিয়া বারোটা বাজিল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করিল ভুজঙ্গধরের চাকর ঘনাই। বোঝা গেল ঘনাই ঊর্দ্ধশ্বাসে আসিয়াছে।

হাঁপাইতে হাঁপাইতে সে বলিল, "বাবু, মাঠান আবার বেরিয়ে গেলেন—"

"সে কি রে!"

"হ্যাঁ বাবু। প্রকাণ্ড একটা চার ঘোড়ার গাড়ি এসে দাঁড়াল বাড়ির সামনে, কি বড় বড় ধবধবে সাদা ঘোড়াগুলো। গাড়ির ভিতর থেকে চোগোঁপ্পা একটা

লোক মুখ বার করে বললে—“ইন্দুমতী, এস। মা ঠাকরুণ ছুটে বেরিয়ে এসে গাড়িতে চেপে বসলেন, আর টগবগ টগবগ করে গাড়িটা বেরিয়ে গেল ঝড়ের বেগে!”

“তাই নাকি!”

আমরা যথাসম্ভব দ্রুতবেগে অকুস্থলে গিয়া উপস্থিত হইলাম। কেহ কোথাও নাই চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ; ইন্দুমতী আর ফেরে নাই।

মন্মথ

১

কয়েকটি ট্যাবলেট বিলটুর হাতে দিয়ে বললাম, "দুটো করে' ট্যাবলেট তিন ঘণ্টা অন্তর খাবে। কাল এসে একবার খবর দিও। যদি দরকার হয় অন্য ওষুধ দেব। এতেই ভাল হয়ে যাবে আশা করি—"

"কি খাব ডাক্তারবাবু—"

"আজ শুধু জল খেয়ে থাক—'

"শুধু জল?"

"শুধু জল না পার পাতলা করে' বার্লি খেও।"

বিলটু মুখ বাঁকিয়ে বলল "বার্লি? বার্লি একেবারেই সয় না আমার। খেলেই বমি হয়ে যাবে—"

"পেটের অসুখ করেছে, উপোস দেওয়াই তো ভাল—"

"উপোস দিতে পারি না যে।"

"তাহলে মাকে বোলো গরম ফ্যান একটু নুন আর লেবুর রস দিয়ে—"

"ফ্যান তো গরুতে খায়, আমি কি গরু—"

"গরু ভাতও খায়, তরকারিও খায়। তুমি ভাত তরকারি খাও না? বিলটু মুচকি মুচকি হাসতে লাগল।"

"মাছের ঝোল চলবে?"

"চলবে, যদি তোমার মা মশলা না দিয়ে করে' দেন। ষ্টু খেতে পার—"

"রসগোল্লা?"

"না।"

"রসটা নিংড়ে ফেলে যদি ছানাটা খাই?"

"না—"

বিলটু অপ্রতিভ মুখে বসে রইল। বিলটুর বয়স বারোর কাছাকাছি। আমাদের পাড়াতেই থাকে। কিছুদিন আগে পিতৃহীন হয়েছে। আমরা সবাই তাই গার্জেন হয়ে উঠেছি ওর। অসঙ্কোচে ফাই ফরমাস করি, অসঙ্কোচে শাসন করি, অসঙ্কোচে উপদেশ দি। বিলটু আপত্তি করে না। সকলেরই ফরমাস খাটে, ভান করে যেন সকলেরই উপদেশ শুনছে। আমার নাতিকে যে প্রাইভেট টিউটারটি পড়ান তার কাছে বিলটুও এসে বসে মাঝে মাঝে, হাতের লেখা লেখে, অঙ্ক কষে। ওর মা আশা করে আছে আমি আগামী বছর ওকে স্কুলেও ভরতি করে' দেব। আমার কাছেই বিলটু একটু আধটু আবদারও করে। কয়েকদিন আগেই তাকে ঘুড়ি লাটাই কিনে দিয়েছি।

বিলটু নাকি সুরে বললে—"কি খাব তাহলে বলুন না—"

"বললাম তো, ষ্টু খাও গে।'

"মা অত হাঙ্গামা করতে রাজি হবে না।"

"বেশ, আমাদের বাড়িতে এস, আমি ব্যবস্থা করব।"

বিলটু হয়তো আরও কিছু বলত। কিন্তু দ্বারের দিকে চেয়ে চট করে উঠে পড়ল সে। প্রবেশ করলেন পুরুষোত্তমবাবু। মনুষ্যরূপী মহিষ একটি। শুধু মহিষও নয়, মহিষ এবং শজারুর সমন্বয়। মাথায় একজোড়া শিং সর্ব্বদা উদ্যত হয়ে থাকে ভদ্রলোকের, সর্ব্বাঙ্গে নানারকম কাঁটাও। মনে মনে তিনি বাস করেন পবিত্র অতীত যুগে—যে যুগে সবই ভালো—চাল ডাল দুধ ঘি সস্তা ছিল, নারীদের সতীত্ব ছিল, পুরুষদের ধর্ম্মজ্ঞান ছিল, ঠিক সময়ে বৃষ্টি হ'ত, ছেলেমেয়েদের ঠিক সময়ে বিয়ে হত, সন্তান হত। কিন্তু অদৃষ্টের এমনি ফের সশরীরে তাঁকে বর্ত্তমান যুগে সজ্ঞানে বাস করতে হচ্ছে!

ঘরে ঢুকে আমার সামনে এক বাণ্ডিল চিঠি ফেলে দিয়ে বললেন—"এই নিন। ফনতির বাক্স থেকে পেয়েছি। এর যদি ব্যবস্থা একটা না করেন আই শ্যাল শুট হিম।"

পুরুষোত্তম চলে গেলেন।

২

মন্মথ দেখলাম আমাকে এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করছে। আমাকেও মাঝে মাঝে 'কলে' বেরুতে হয়েছে। দুপুরে যখন ফিরলাম তখন আড়াইটে বেজে গেছে। মন্মথ তখনও দেখলাম কাজে ব্যস্ত রয়েছে খুব। প্রসঙ্গটা তখন উত্থাপন করা সমীচীন হল না। কি জানি উত্তেজিত হয়ে বা অভিভূত হয়ে যদি প্রেসক্রপশন সার্ভ করতে ভুল করে, মুশকিল হবে। বিকেল পাঁচটা নাগাদ ডাকলাম তাকে।

"মন্মথ শোন, একটা কথা আছে—"

ডিসপেন্সারীতে আর তৃতীয় ব্যক্তি ছিল না, সুতরাং সুবিধে হল।

"কি বলছেন।"

"পুরুষোত্তমবাবু আজ সকালে আমাকে এই চিঠিগুলো দিয়ে গেছেন। এগুলো তুমি লিখেছ?"

দেখলাম মন্মথর চোখমুখে একটা মরীয়া ভাব ফুটে উঠল। কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে সে বললে—

"হ্যাঁ, এগুলো আমারই লেখা।"

এ রকম সাফ জবাব প্রত্যাশা করিনি।

"ভদ্রলোকের মেয়েকে এবকম চিঠি লেখার, মানে—?"

মন্মথ চুপ কবে রইল।

"উত্তর দিচ্ছ না যে—"

"আমি ওকে ভালবাসি, সার।"

লক্ষ্য করলাম গলা একটু কেঁপে গেল।

"তুমি উগ্রক্ষত্রিয়, বিবাহিত, ছেলে-পিলে আছে তোমার, তুমি হঠাৎ ব্রাহ্মণের কন্যাকে ভালবাসতে গেলে কেন—"

"মাপ করবেন সার। এ 'কেন'র জবাব দিতে বড় বড় কবিরা

পারেন নি, আমিও পারব না। কিন্তু বিশ্বাস করুন সত্যিই আমি তাকে ভালবাসি"

"কিন্তু এরকম ভালবাসার পরিণাম কি জান ?"

"জানি—"

"তবে – ?"

মন্মথ চুপ করে' রইল। জবাব সে আগেই দিয়েছিল। বড় বড় কবিরা যে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন নি, সে প্রশ্নের নিরুত্তরই উত্তর।

"ফনতুর সঙ্গে তোমার আলাপ হল কি করে।"

"একদিন দেখলাম সে তাদের বাইরের বারান্দায় বসে বসে' কাঁদছে। আমি যাচ্ছিলাম সেদিক দিয়ে। জিজ্ঞাসা করলাম কাঁদছ কেন। সে বললে বড্ড মাথা ব্যথা করছে। জিজ্ঞাসা করলাম—ওষুধ খাওনি কিছু ? বললে—বাবা এক ডোজ হোমিওপ্যাথিক'ওষুধ দিয়েছেন। বলেছেন সাতদিন পরে আর এক ডোজ দেবেন। আমি ফিরে এসে তাকে অ্যাসপিরিনের গুলি পাঠিয়ে দিলাম একটা। তার পর মাঝে মাঝে লুকিয়ে সে অ্যাসপিরিনের গুলি নিতে আসত। বিলটুকেও পাঠাত মাঝে মাঝে। এই রকম করেই আলাপ শুরু হয়।"

"তারপর—?"

মন্মথ চুপ করে রইল।

"চিঠি লিখতে আরম্ভ করলে কবে থেকে ?"

"তার কিছুদিন পর থেকে।"

"চিঠি নিজেই গিয়ে দিয়ে আসতে ?"

"আজ্ঞে না।"

"তবে— ?"

"বিলটুর হাতে পাঠাতাম।"

"তোমার চিঠির জবাব পেয়েছ কিছু ?"

"অনেক। রোজই পাই—"

"রোজই ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, প্রায় রোজই। ফনতুও আমাকে সত্যি ভালবাসে সার। আপনার যদি বিশ্বাস না হয় দেখাচ্ছি আপনাকে তার চিঠি—"

মন্মথ চলে গেল এবং খানিকক্ষণ পরে সে-ও এক বাণ্ডিল চিঠি নিয়ে এল। চক্ষুস্থির হয়ে গেল আমার। প্রতি চিঠিতেই সম্বোধন—প্রাণেশ্বর! বানানটা অবশ্য ঠিক করে লিখতে পারে নি, লিখেছে—"প্রাণেরসর"। অতিশয় চিন্তিত হয়ে পড়লাম। এই সব চিঠি যদি পুরুষোত্তম বাবু দেখেন তাহলে— !

মন্মথকে বললাম, "আচ্ছা, তুমি যাও, চিঠিগুলো থাক আমার কাছে—"

মন্মথ চিঠিগুলোর দিকে একবার সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করে' চলে গেল।

ঠিক সন্ধ্যা বেলায় মন্মথ গেল ইনজেকশন দিতে। একটু পরে পুরুষোত্তমবাবু এলেন। আমি ভেবে চিন্তে একটা বুদ্ধি বের করে রেখেছিলাম।

"আপনার মেয়ের হাতের লেখা খানিকটা চাই। মন্মথের কাছ থেকে কোনও চিঠি যদি বেরোয় মিলিয়ে দেখতে হবে। আপনি বাড়ি গিয়ে তাকে দিয়ে খানিকটা বাংলা লিখিয়ে আনুন। নিজের সামনে লেখাবেন।"

"নিশ্চয়ই।"

পুরুষোত্তমবাবু চলে গেলেন এবং একটু পরেই ফিরে এসে ফনতুর হস্তাক্ষর দাখিল করলেন আমার সামনে।

"আপনার সামনে লিখেছে তো—"

"নিশ্চয়ই। আমি 'ভক্তিযোগ' থেকে ডিকটেট করেছি সে লিখেছে—"

লেখা দেখে আশ্বস্ত হলাম। একেবারে আলাদা হস্তাক্ষর। কিন্তু ও চিঠিগুলো কার লেখা তাহলে!

বললাম, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন আপনার মেয়ে মন্মথকে কোনও চিঠি লেখেনি"

"কি করে জানলেন—"

"মন্মথর কাছে যে চিঠি পেয়েছি তার হস্তাক্ষর একেবারে আলাদা"।

"আমি স্বচক্ষে দেখতে চাই সেটা—"

দেখালাম একখানা চিঠি।

পুরুষোত্তমবাবুর মুখের মেঘ অনেকটা কেটে গেল। বললাম—"মন্মথকে শাসন করে দেব আমি। আর ও চিঠি লিখবে না। আমি গ্যারান্টি রইলাম। ফের যদি চিঠি পান, আমাকে এনে দেখাবেন, আমি দূর করে দেব ওকে—"

সন্তুষ্ট হয়ে পুরুষোত্তমবাবু চলে গেলেন।

আমি কিন্তু কৌতূহলী হয়ে উঠলাম। ফনতির নাম দিয়ে ও চিঠিগুলো কে লিখলে!

বিলটুকে ডেকে পাঠালাম।

"আমাকে ডেকেছেন?"

"হ্যাঁ। কেমন আছ তুমি"

"ভাল আছি। ও বেলা ষ্টু্য খুব ভাল লেগেছিল। এ বেলা দুখানা রুটি খাব?"

"আগে একটা কাজ কর দেখি। তোমার পুরোনো বাংলা হাতের লেখার খাতা আছে—"

"এই খানেই তো আছে—"

"নিয়ে এসো।"

"কি করবেন খাতা নিয়ে—"

"দরকার আছে। আন না—"

বিলটু এক ছুটে গিয়ে খাতা নিয়ে এল। সমস্যার সমাধান হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। বিলটুই যে চিঠিগুলির লেখক তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইল না। মন্মথ ইনজেকশন দিতে গিয়েছিল, সে-ও এসে ঢুকল।

বললাম—"মন্মথ, তোমার চিঠির একখানাও ফনতির লেখা নয়—"

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। বিলটুর মুখও ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল।

"ফনতুরই লেখা সার। বিলটুকে জিজ্ঞাসা করুন।"

একখানা চিঠি বার করে' বিলটুকে দেখালাম।

"এসব চিঠি কে লিখেছে—"

বিলটু ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল আমার দিকে।

"সত্যি কথা বল—"

"আমি লিখেছি। শৈলদি, আভাদি, পুষ্পদি যা যা বলে দিত আমি লিখে দিতুম। ফনতিদি একদিনও লেখায় নি—"

"তুমি লিখতে কেন—"

"উত্তর এনে দিলে কম্পাউণ্ডারবাবু আট আনা পয়সা দিতেন যে। সেই পয়সা দিয়ে আমরা সবাই মিলে রসগোল্লা খেতাম।"

মন্মথকে বকতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তার বিবর্ণ মুখের দিকে চেয়ে আর বকতে পারলাম না।

বর্ণে বর্ণে

একটি বাদামি, অপরটি কালো। দুইটিই বেশ হৃষ্টপুষ্ট, সতেজ এব
কচি। যাঁহারা পছন্দ করিতে আসিয়াছিলেন তাঁহারা দুইটিকেই দেখিয়
গেলেন। তাঁহারা চলিয়া যাইবার পর বাদামি বলিল, "আমাকেই পছন্
করবে দেখিস।"

কালো উত্তর দিল, "কি ক'রে জানলি সেটা?"

"দেখলি না আমার দিকে কেমন করে' চাইছিল।"

"আমার দিকেও তো চাইছিল।"

"তোর দিকে যে ভাবে চাইছিল তা আমি দেখেছি। কিন্তু তুই শুধ
চাউনিটাই দেখেছিস, ঠোঁটের কোনে যে হাসিটা উঁকি দিচ্ছিল তা
দেখিস নি"

উভয়ে তর্ক করিতে লাগিল।

যাঁহারা পছন্দ করিতে আসিয়াছিলেন তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন কাহাকে
পছন্দ হইল খবর পাঠাইবেন।

২

ঠিক পাশের বাড়িতে আর একটি অনুরূপ ঘটনা ঘটিতেছিল। সে
বাড়িতেও একটি বাদামি, আর একটি কালো। যাঁহারা পছন্দ করিতে
আসিয়াছিলেন তাঁহারা নানাভাবে দুইটিকে দেখিলেন, কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে
উপনীত হইতে পারিলেন না। তাঁহারাও যাইবার সময় বলিয়া গেলেন যে
পরে খবর পাঠাইবেন কাহাকে পছন্দ হইল।

দ্বিতীয় বাড়ির বাদামি এবং কালো তর্ক করিল না। তাহারা তাহাদের
অভিমত আপন আপন অন্তরেই নিবদ্ধ রাখিল।

বাদামি ভাবিল, "পছন্দ আমাকেই করবে, ওই কুচকুচে কালোকে কেউ আবার পছন্দ করে না কি—"

কালো ভাবিল, "রং আমার কালো বটে কিন্তু আমার চোখ, আমার নাক, আমার মুখের গড়ন এ সবের কি কোন দাম নেই? ওর রংটা হয় তো একটু ফিকে কিন্তু ওই থ্যাবড়া নাক, বসা চোখ, প্রকাণ্ড হাঁ কি পছন্দ করবার মতো?"

৩

প্রথমে বাড়িতে পছন্দ হইল কালোটিকে। কারণ শ্যামাপূজায় কালো পাঁঠা বলি দেওয়াই নিয়ম।

দ্বিতীয় বাড়িতে পছন্দ হইল বাদামিকে। কারণ যিনি তৃতীয় পক্ষে বিবাহ করিবেন তিনি কালো মেয়ে দু'চক্ষে দেখিতে পারেন না।

——

পক্ষী বদল

ইন্দুবালার কথা শুনে অবাক হয়ে গেলাম।

ইন্দুবালা যা বলছে সেটা অবিশ্বাস্য। কিন্তু আমি নিজের চোখে যেটা রোজ দেখছি সেটাকে তো অস্বীকার করা যায় না। জিতেনবাবুর, (মানে ইন্দুবালার স্বামীর,) স্বভাব সত্যিই বদলেছে খুব। বিলেত যাবার আগে যে জিতেনবাবুকে আমি চিনতাম তাঁর সঙ্গে সত্যিই এঁর আকাশ-পাতাল তফাত। তিনি সিগারেট দূরের কথা পানটি পর্য্যন্ত খেতেন না, অত্যন্ত নিষ্ঠাচারী নির্ব্বিবাদী লোক ছিলেন, কারও সাতে-পাঁচে থাকতে দেখিনি কখনও তাঁকে। খট্ খট্ করে' নিজের কাজকর্ম্ম করতেন, আর অবসর পেলে দাওয়ায় বসে কৃত্তি-বাসী রামায়ণটি পড়তেন। রাস্তায় দেখা হ'লে মৃদু হেসে সসঙ্কোচে সরে' দাঁড়াতেন এক ধারে, যেন রাস্তায় সামনা-সামনি দেখা হয়ে যাওয়াটা মস্ত অপরাধ। কোন বিষয়ে তাঁকে প্রতিবাদ করতেও শুনিনি, জীবনের সমস্ত ঝঞ্ঝাট ঝামেলাকে তিনি সবিনয়ে মেনে নিয়েছিলেন, সমস্ত অত্যাচার অবিচারকেও। অর্থাৎ তিনি জীবন যুদ্ধের সৈনিক ছিলেন না। জীবন সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব ছিল অনেকটা স্টেশন প্ল্যাটফর্মের যাত্রীর মনোভাবের মতো। একটু পরে ট্রেণ এলেই তো চলে যেতে হবে, প্ল্যাটফর্ম নিয়ে বা প্ল্যাটফর্মে সমবেত যাত্রী-যাত্রিনীদের নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ কি! যতক্ষণ ট্রেণটা না আসছে ততক্ষণ ভদ্রতা বজায় রেখে কোন রকমে গা বাঁচিয়ে থাকতে পারলেই যথেষ্ট। এই তাঁর মনোভাব।

কিন্তু বিলেত থেকে ফিরে এসে যে জিতেনবাবুকে আমি দেখলাম তিনি একেবারে অন্যলোক। টিন টিন সিগারেট ওড়াচ্ছেন, ক্রমাগত পান জরদা খাচ্ছেন, হাফশার্ট পরে' বাটারফ্লাই গোঁফ রেখে একটা মোটর সাইকেল চড়ে' দামড়ে বেড়াচ্ছেন চতুর্দ্দিকে। নেতাও হয়েছেন একটা উগ্রপন্থী রাজনৈতিক

দলের। বিলেত যাবার আগে আমি যে জিতেনবাবুকে চিনতাম তিনি সসঙ্কোচে সব কিছুই মেনে নিতেন, এ ভদ্রলোক যেন কিছুই মানতে চান না। এখানকার প্রবীণ উকিল গোলকবাবুই ছিলেন আমাদের মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান। তাঁকে সরাবার কল্পনাও কেউ কখনও করিনি আমরা। বিলেত থেকে ফিরে এসে দেখি তাঁকে পদচ্যুত করে জিতেনবাবু নিজেই চেয়ারম্যান হয়েছেন। যে লোক ধীর স্থির বিনয়ী নির্ব্বিবাদী, ছিল সে যে এমন অশান্ত চঞ্চল উগ্র একগুঁয়ে হয়ে উঠতে পারে তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা সত্যিই শক্ত। এ যা ধরবে তা করবেই। মাথায় গুরুতর আঘাত লাগলে চরিত্রের এ রকম পরিবর্ত্তন হয় শুনেছি। গল্পে উপন্যাসে পড়েছি, সিনেমাতেও তো হরদম দেখছি অন্ধ দৃষ্টি ফিরে পাচ্ছে, বোবা কথা কইছে, শয়তান দেবতা হয়ে যাচ্ছে। জিতেনবাবুও মাথায় গুরুতর আঘাতই পেয়েছিলেন। প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে একবার তিনি গ্রামান্তর থেকে ফিরছিলেন। গাছের প্রকাণ্ড একটা ডাল ভেঙে নাকি তাঁর মাথায় পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে বজ্রাঘাতও হয় একটা। জিতেনবাবু অজ্ঞান হয়ে পড়েন। জিতেনবাবুর সঙ্গে ছিল জিতেনবাবুরই চাকর হারু। সেই দৌড়ে গিয়ে লোকজন ডেকে আনে। সবাই ধরাধরি করে অজ্ঞান অবস্থাতেই বাড়িতে তুলে আনে তাঁকে। বাড়িতে কান্নাকাটি পড়ে গেল। চোখ বন্ধ, নিশ্বাস পড়ছে না, নাড়ি পাওয়া যাচ্ছে না দেখে সবাই ভেবেছিল সে মরেই গেছে। এমন কি বিনোদ ডাক্তার পর্য্যন্ত। জিতেনকে খাটিয়ায় তুলে শ্মশানের উদ্দেশ্যেও নাকি যাত্রা করেছিল সবাই। পথের মাঝে এক গাছতলায় খাটিয়া নামাবার পর দেখা গেল জিতেনের হাত-পা নড়ছে, নিশ্বাস পড়ছে একটু একটু। তারপর চোখ খুলে চাইলেন। শুনেছি একটু হেসেও ছিলেন না কি! তখন সবাই আবার তাঁকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে এল। যে আঘাত তাকে মৃতবৎ করে' ফেলেছিল তা যে খুবই সাংঘাতিক তাতে সন্দেহ করবার কিছু নেই, তাতে চারিত্রিক পরিবর্ত্তন হতেও পারে। চারিত্রিক পরিবর্ত্তন যে হয়েছে তা তো দেখতেই পাচ্ছি কিন্তু তার স্ত্রী ইন্দুবালা যা বলছে তা কি বিশ্বাস্য? আদালত তা বিশ্বাস করবে? আমার মনে হয় না। কিন্তু জিতেনবাবুও

না-ছোড়, তিনি আদালতে কেস ঠুকে দিয়েছেন। মকোর্দ্দমায় শেষ পর্য্যন্ত কি হবে তা বলা শক্ত।

জিতেনবাবুকে একদিন বলেছিলাম, "ইন্দু যখন আপনাকে স্বেচ্ছায় ছেড়ে চলে গেছে তখন আপনি আবার একটা বিয়ে করুন না। আপনার যখন ছেলেপিলে হয় নি করতে বাধাটা কি। কেউ দোষ দেবে না আপনাকে।"

জিতেনবাবু কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন, তারপর আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে বললেন, 'ইন্দুকেই আমার চাই। এর জন্য যদি সর্ব্বস্ব পণ করতে হয় তাও করব।"

ইন্দু দূর সম্পর্কের বোন হয় আমার। মবা জিতেনবাবু বেঁচে ওঠবার পরেই যে সে কোলকাতায় তার বাপের বাড়ি চলে গেছে, আর ফেরেনি। আর ফিরবেও না চিঠি লিখেছে। জিতেনবাবু কিন্তু ছাড়বেন না। আইনত লড়ে' দেখতে চান তিনি। তাঁর ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছে আইনত যদি তিনি ইন্দুকে আনতে না পারেন, বে-আইনী উপায় অবলম্বন করতেও ইতস্তত করবেন না।

মনে করলাম নিজেই একবার কোলকাতা চলে যাই, ইন্দুকে বুঝিয়ে দেখি সে যদি আসতে রাজি হয়। আদালতে এ নিয়ে কেলেঙ্কারি করাটা সব দিক থেকেই অশোভন। ইন্দুর বাবাকে চিঠি লিখে কোনও ফল হয় নি। তিনি উত্তর দিয়েছেন, "ইন্দু তার স্বামীর ঘর করুক এটা আমারও কম কাম্য নয়। তাকে অনেক বুঝিয়েছি, কিন্তু সে কিছুতেই রাজি হচ্ছে না, কি করব বল। মেয়েকে তো আর বাড়ি থেকে দূর করে' দিতে পারি না। তুমি এসে যদি বুঝিয়ে ওকে নিয়ে যেতে পার আমি আনন্দিতই হব !"

একদিন চলেই গেলাম। গিয়ে দেখি ইন্দু বিধবার বেশ পরে আছে। আড়ালে ডেকে বললাম, "ব্যাপার কি বল দেখি ! স্বামী থাকতে বিধবার বেশ কেন ?"

"উনি আমার স্বামী নন"।

"স্বামী নন তো কে ?"

"উনি বীরেনবাবু—"

ক্ষণকাল চুপ ক'রে থেকে ইন্দু বললে, "আমি যখন কলেজে পড়তাম তখন বীরেনবাবু বলে' একজন ভদ্রলোক আমাকে বিয়ে করবার জন্যে খুব ঝুঁকেছিলেন। কিন্তু তিনি কায়স্থ ছিলেন বলে' বাবা বিয়ে দেন নি। বীরেন বাবু তারপর আমাকে চিঠি লেখেন যে আমি তার সঙ্গে পালিয়ে যেতে রাজি আছি কি না। লোকটাকে আমি দু'চক্ষে দেখতে পারতাম না। কড়া গোছের একটা উত্তর লিখে দিলাম। চিঠি পেয়ে তিনি আত্মহত্যা করলেন। আমার বিশ্বাস তারই প্রেতাত্মা আমার মৃত স্বামীর দেহে ভর করে আছে।"

আমি সবিস্ময়ে ইন্দুর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

পাগল টাগল হয়ে যায়নি তো !

"হঠাৎ তোমার এমন আজগুবি ধারণা হল কেন ?"

"এঁর চাল-চলন কথাবার্তা, চোখের চাউনি ঠিক বীরেনবাবুর মতো, আমার স্বামীর মতো একটুও নয়। তা ছাড়া আর একটা কাণ্ড যা ঘটেছিল তা শুনলে আপনারা কেউ বিশ্বাস করবেন না।"

"কি কাণ্ড ?"

"গত মাঘ মাসে একদিন অনেক রাত করে উনি বাড়ি ফিরলেন। ওঁর খাবার ঢাকা দেওয়া ছিল আমি জেগেছিলাম খালি। আর সবাই ঘুমিয়ে পড়েছিল। ফিরে এসে উনি বসে খাচ্ছিলেন, আমি সামনে বসে ছিলাম। খেতে খেতে হঠাৎ বললেন, আমাকে একটু পেয়ারার জেলি এনে দাও তো। জেলি ছিল ভাঁড়ার ঘরে। প্রকাণ্ড উঠোন পেরিয়ে সেই শীতে ভাঁড়ার ঘরে গিয়ে জেলি আনতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। বললাম, কাল এনে রাখব। আজ গুড় দিয়ে ওই রুটিখানা খেয়ে নাও না। উনি বললেন, জেলি আমার এখনই চাই, কাল পর্য্যন্ত তর সইবে না। জীবনে যখনই যা চেয়েছি না নিয়ে ছাড়িনি। জান ত' কথায় বলে স্বভাব যায় না ম'লে। আমারও যায়নি। জাতিভেদের

ওজুহাতে বীরেন মিত্তিরকে তোমরা ঠেকিয়ে রাখবে ভেবেছিলে, কিন্তু তা যে পারনি সেটা তুমি অন্তত বুঝেছ এত দিনে।"

ইন্দুর কথা শুনে আমি অবাক হয়ে গেলাম। আপনারাও হচ্ছেন নিশ্চয়।

বললাম, "তার মানে তুমি বলতে চাও খাঁচাটা ঠিক আছে পাখীটা বদলে গেছে?"

ম্লান হেসে ইন্দু বললে, "তাই তো মনে হচ্ছে।"

কার্য কারণ

১

বৃষ্টি পড়িলে এখনও আমার পীরু মিঞা এবং ভূতনাথের কথা মনে পড়ে। কার্য-কারণের সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে গিয়া যাঁহারা কেবল স্থূল স্বার্থপরতা ছাড়া আর কিছু হিসাবের মধ্যে ধরিতে চান না, তাঁহারা বুদ্ধিমান ব্যক্তি। হয়তো পীরু মিঞা এবং ভূতনাথের আচরণের মধ্যেও প্রচ্ছন্ন স্বার্থ নিহিত ছিল, বিশ্লেষণ করিবার প্রবৃত্তি হয় নাই, কারণ মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলাম।

২

প্রায় পঁচিশ বছর আগেকার কথা।

দুইদিন হইতে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়িতেছিল। মুষলধারা বৃষ্টির সহিত উন্মত্ত পবন মিলিয়া যে কাণ্ড করিতেছিল, তাহা প্রায় অবর্ণনীয়। সভ্যতা হইতে বেশ কিছু দূরে (স্টেশন হইতে দশ ক্রোশ পোস্টাপিস হইতে দুই ক্রোশ) যে গ্রামে তখন আমাদের বাস ছিল, তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থা অকথ্য হইয়া উঠিয়াছিল। একটি গাছ খাড়া ছিল না, খড়ের চাল উড়িয়া গিয়াছিল, মাটির দেওয়ালগুলি ভূশায়ী হইয়াছিল, নদী-নালা, খাল-বিল, মাঠ-ঘাট জলে কর্দমে পরিপূর্ণ হইয়া যে দৃশ্যের অবতারণা করিয়াছিল, তাহা বিদ্যাপতি বা চণ্ডীদাসের চিত্তে কি ভাব উদ্রিক্ত করিত জানি না, আমার হৃদয়ে তাহা এক অপ্রত্যাশিত ভাব সঞ্চার করিয়াছিল, মনে পড়িতেছে। আমি মুগ্ধ হইয়া বসিয়া ছিলাম। বর্ষার শোভা দেখিয়া নয়, ইট, চুন, সুরকি ও সিমেণ্টের মহিমা প্রত্যক্ষ করিয়া। গ্রামের মধ্যে একমাত্র আমাদের বাড়িটিই পাকা। ঝড়বৃষ্টির বিপুল তাণ্ডবে সেটি অক্ষত ছিল।

আমার সেই মুগ্ধ ভাবও কিন্তু মধ্যে মধ্যে বিস্মিত হইতেছিল। আমি

একজনের আগমন প্রত্যাশা করিতেছিলাম। প্রিয়ার নয়, পিওনের। তখন প্রিয়া-বিরহে ব্যাকুল হইবার বয়স হয় নাই। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়া বাড়িতে বসিয়া ছিলাম। কলিকাতায় বন্ধু ছকুকে টাকা দিয়া আসিয়াছিলাম, পরীক্ষার ফল বাহির হইবামাত্র তারযোগে যেন আমাকে জানায়। সে জানাইবে ঠিক, কিন্তু এই দুর্যোগে এক্সপ্রেস তারও কি এই সুদূর মফঃস্বলে পৌঁছিবে? পোস্টাপিস দুই ক্রোশ দূরে, টেলিগ্রাম যদি পৌঁছিয়াও থাকে, এই ঝড়বৃষ্টি মাথায় করিয়া পিওন কি আসিতে পারিবে? পিওনকে অবশ্য বারবার বলিয়া আসিয়াছি, বকশিশের লোভও দেখাইয়াছি, কিন্তু যে রকম দুর্যোগ···

আর একটা কারণে আশা করিতেছিলাম যে, পিওন হয়তো আসিতে পারে। আমি এবং ওপরের ভুতনাথ এ অঞ্চলের মাত্র এই দুইটি বালকই এবার ম্যাট্রিকুলেশন দিবার সুযোগ পাইয়াছে। দশ ক্রোশের ভিতর একটি লোয়ার প্রাইমারি স্কুল ছাড়া আর কোনও বিদ্যালয় সেকালে ছিল না। সুতরাং আমাদের পরীক্ষার ফল কি হয়, জানিবার জন্য সকলেই উৎসুক। সকলেই প্রতীক্ষা করিতেছিল, আমরা এ অঞ্চলের মান রাখিতে পারি কি না।

বাহিরের ঘরটিতে উৎকর্ণ হইয়া বসিয়া ছিলাম। বৃষ্টির বিরাম নাই। ভেককুলের আনন্দ-কলরবে চতুর্দিক মুখরিত। বাতায়ন দিয়া যতটুকু দেখিতে পারিতেছিলাম, তাহাতে হতাশই হইতেছিলাম। জনপ্রাণী কেহ নাই, কেবল বাতাসের বেগে সদ্যচ্ছিন্ন পত্ররাশি মাঝে মাঝে উড়িয়া আসিয়া কাদায় লুটাইয়া পড়িতেছে। ডোবার ধারে কয়েকটি বক চিত্রার্পিতবৎ বসিয়া আছে। এই দুর্যোগেও তাহাদের ধ্যানভঙ্গ হয় নাই। মাঝে মাঝে ছাগলের ডাকের মতো শব্দ পাইতেছিলাম, আমাদের চাকরটা বলিল যে, উহাও ব্যাঙের ডাক।।

সূর্যদেবের দেখা নাই। আকাশ মেঘময়। সকাল এবং বিকালের একই রূপ। কিন্তু সন্ধ্যা যখন ঘনাইয়া আসিল, তখন সে-রূপ আরও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। বাতাসের বেগ আরও বাড়িল, আকাশে আরও মেঘ ঘনাইয়া

আসিল, বিদ্যুৎস্ফুরণে বজ্রগর্জনে চতুর্দিক সচকিত হইয়া উঠিল। মনে হইতে লাগিল, বুঝি প্রলয়ের কালরাত্রি ঘনাইয়া আসিতেছে।...ঠিক করিলাম বাহিরের ঘরেই শুইব। পিওনের আসিবার আশা নাই। কিন্তু যদি আসে...

৩

গভীর রাত্রে ধড়মড় করিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিলাম। জোরে শব্দ হইল। বাজ পড়িল না কি? কান পাতিয়া রহিলাম। বাহিরে বাতাস ও বৃষ্টির মাতামাতি সমানে চলিয়াছে। আবার শব্দ হইল। কড়া-নাড়ার শব্দ। তাড়াতাড়ি উঠিয়া কপাট খুলিলাম। তবে কি...

কপাট খুলিতেই কিন্তু আপাদমস্তক সিক্ত ও কর্দমাক্ত যে ব্যক্তিটি হুড়মুড় করিয়া ঢুকিয়া পড়িল, সে পিওন নয়, পীরু মিঞা। তাহার বাঁকা নাক এবং সামনের ফোকলা দাঁত ভুল হইবার নয়। কিন্তু এ সময়ে, এই ভীষণ দুর্যোগের মধ্যে জমিদার জবরদস্ত খাঁর গোমস্তা পীরু মিঞাকে দেখিব বলিয়া প্রত্যাশা করি নাই।

"আরে খোকাবাবু তুমি বাইরে আছ, ভালই হয়েছে, তোমার কাছেই এসেছি, বড় জরুরি দরকার—"

"কি বলুন তো?"

"এই চিঠিখানা পড়। চেঁচিয়েই পড়—"

পড়িলাম—কে একজন বিনোদ সিংহ লিখিতেছে—"মিঞা সাহেব, আদাব জানিবেন। খোদার মরজিতে আশা করি খুশমেজাজে আছেন। আপনার মনিব শেখ জববদস্ত খাঁ আগামী শুক্রবার ফিরিবেন। তাঁহার জন্য ঘাটে প্রত্যুষে যেন নৌকা প্রস্তুত থাকে। তাঁহার হুকুমে এই পত্র আপনাকে লিখিতেছি।"

চিঠি পড়া শেষ হইবামাত্র পীরু মিঞা প্রশ্ন করিলেন—"প্রত্যুষ মানে কি?"

"প্রত্যূষ মানে ভোর।"

"ভোর মানে কি?"

"ভোর মানে সকাল।"

"কি বিপদ! সকাল মানে কি! যখন পহেলা মোরগ ডাকে, তখনও সকাল, যখন দোসরা মোরগ ডাকে, তখনও সকাল। প্রত্যূষ মানে কোন্ সকাল?"

বিব্রত হইলাম। অভিধান খুঁজিলেও এ প্রশ্নের সদুত্তর মিলিবে কিনা সন্দেহ। পীরু মিঞার কাছে নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ করিতে বাধিল। বলিয়া দিলাম—"যখন পহেলা মোরগ ডাকে তখনই প্রত্যূষ।"

"ঠিক তো?"

"ঠিক।"

"যাক, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। জানতাম, তোমার কাছে এলেই হদিস পাব।"

"এই জন্যেই আপনি এসেছিলেন?"

"এই জন্যেই—"

বিস্মিত হইলাম।

"এই দুর্যোগ মাথায় করে একটা কথার মানে জানতে এসেছেন!"

"কাল ঠিক 'প্রত্যূষে' যদি নৌকা হাজির না থাকে, তাহলে দুর্যোগ আরও ভয়ানক হবে। জবরদস্ত খাঁকে তুমি চেন না খোকাবাবু।"

পীরু মিঞার চোখে একটা গর্ব্ব যেন জ্বলজ্বল করিয়া উঠিল।

"কেন, কি করবেন তিনি?"

"একদিন কি করেছিলেন দেখ—"

পীরু মিঞা তাঁহার বাঁকা নাক ও ফোকলা দাঁতের দিকে এমনভাবে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া রহিলেন, যেন আমাকে কাহারও মহৎ কীর্তি দেখাইতেছেন।

"তখন আমারও জোয়ান বয়েস, খাঁ-সাহেবেরও জোয়ান বয়েস। তোমাদের তখন জন্ম হয় নি। ফুনশিয়ার মাঠে বগেরি শিকার করতে

গিয়েছিলেন। বলে গিয়েছিলেন, আমি যেন ঠিক সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া নিয়ে হাজির হই। আধ ঘণ্টা দেরি হয়েছিল আমার। ঠিক মুখের উপর বুটসুদ্ধ এইসা লাথি ঝাড়লেন যে—"

পীরু মিঞা বাক্য শেষ করিলেন না। ফোকলা দাঁত দুইটি আরও প্রকটিত করিয়া একটু হাসিলেন শুধু।

"কিসে করে' এলেন এতদূরে আপনি ?"

"মোষের গাড়িতে। হাঁটতেও হয়েছে একটু। গাছ পড়ে রাস্তাই বন্ধ হয়ে গেছে যে। আচ্ছা, আমি আর বসব না। নৌকোর ব্যবস্থা করতে হবে গিয়ে—"

পীরু মিঞা চলিয়া গেলেন। আমি সবিস্ময়ে ভাবিতে লাগিলাম, সত্যই কি পীরু মিঞা প্রাণের ভয়েই এতটা কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন ?

আধঘণ্টা পরে আর এক কাণ্ড ঘটিল। আপাদমস্তক ভিজিয়া ভূতনাথ আসিয়া হাজির হইল। তাহার বাড়ি নদীর ওপারে। সাঁতরাইয়া আসিয়াছে !

"তুই ফার্স্ট ডিভিসনে পাশ করেছিস।"

"কি করে জানলি ?"

"কোলকাতার চিঠি পেলাম একটু আগে। পিওনটা সন্ধ্যের পর এল। তোর টেলিগ্রাম নিশ্চয় আসে নি। আসবে কি করে ? টেলিগ্রামের তারই ছিঁড়ে গেছে। আমি ভাবলাম, তোকে সুখবরটা দিয়ে আসি।"

"তুই ?"

"আমি ফেল মেরেছি।"

ভূতনাথের হাসি আকর্ণ বিস্তৃত হইয়া গেল।

"আমি আর বসব না ভাই। মা ভাববে। মাকে লুকিয়ে পালিয়ে এসেছি।"

মুচকি হাসিয়া ভূতনাথও চলিয়া গেল।

ভূতনাথের সঙ্গে আমার প্রেমের সম্পর্ক ছিল না। ক্লাসের উঁচা ছেলে

বলিয়া তাহাকে ঘৃণাই করিতাম। গুণ্ডামি করিয়া বেড়ানোই তাহার কাজ ছিল। সে কেন···

কোনও সদুত্তর খুঁজিয়া পাইলাম না। আজও পাই নাই।

অনেক দিন পরে পীরু মিঞার সম্বন্ধে খুব বিশ্বস্তসূত্রে আর একটি খবর শুনিয়া আরও বিস্মিত হইয়াছি। ঘোড়া হইতে পড়িয়া গিয়াই নাকি পীরু মিঞার নাক বাঁকিয়াছিল, দাঁত ভাঙিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার মনিব জবরদস্ত খাঁ যে সত্য সত্যই জবরদস্ত, একথা সকলের কাছে সগর্বে প্রচার করিবার সুযোগ পাইলে তিনি সত্য-মিথ্যা, সম্ভব-অসম্ভবের গণ্ডী লঙ্ঘন করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করেন না। প্রভু যে লাথি মারিযা তাঁহার মুখের চেহারা বদ্‌লাইয়া দিয়াছেন, এই মিথ্যা কথা বলিয়া তিনি আনন্দিত হন, লজ্জিত হন না!

মহীয়সী মহিলা

ট্রেণে বেশ ভীড় ছিল। গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ী ফিরছিলাম। থার্ড ক্লাসের টিকিট। আমি একটি কামরার এক কোণে অতি কষ্টে বসবার জায়গা করে' নিয়েছিলাম, কিন্তু আর বসবার জায়গা ছিল না। দাঁড়িয়েছিল অনেকে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের লোক একসঙ্গে জুটেছিলাম সেই কামরাটিতে। বাঙালী,বিহারী, মাড়োয়ারী, সাঁওতাল, পাঞ্জাবী সবদার এবং আরও বহুপ্রকার ইতর অথবা ভদ্র চেহারার লোক কেবলমাত্র দেখে যাদের জাতিনির্ণয় করা অসম্ভব। পরস্পরের মধ্যে অমিল ছিল অনেক মিলও হয়তো ছিলো। কিন্তু একটি বিষয়ে আমরা সর্বতোভাবে একমত হয়েছিলাম। কামরায় আর যেন কেউ উঠতে না পারে। ওঠবার সম্ভাবনাও অবশ্য কম ছিল, কারণ. কামরার ডানদিকের দরজায় দাঁড়িয়েছিলেন একজন ভোজপুরী সিপাহী। তার মুখে প্রকাণ্ড গোঁফ, হাতে বিরাট লাঠি। চোখ মুখের দৃষ্টিও কমনীয় নয়। আর বাঁ দিকে দরজায় ছিলেন সরদারজি। ঘন ভ্রূ, ঘন চাপদাড়ি, গোঁফও মানানসই-রকম ঘন-- মনুষ্যবেশী সিংহ একটি। প্রায় কোনও ষ্টেশনেই কেউ উঠতে সাহস করছিল না। বড় বড় দুটো জংসন পেরিয়ে গেল, সিপাহিজী এবং সরদারজিকে দরজার কাছ থেকে একচুল নড়াতে পারল না কেউ। সিপাহিজী এবং সরদারজীর উপর সমস্ত কামরাটির ভার দিয়ে আমরা সকলেই নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম।

কিন্তু দক্ষিণ দ্বারে অবশেষে শত্রু হানা দিল। স্টেশনটি খুব ছোট। সিপাহিজী ভাবতেই পারেন নি যে, এই স্টেশনে এমন একটা পল্টন এসে হাজির হতে পারে। তিনি তাই খৈনি প্রস্তুত করতে ব্যস্ত ছিলেন। অর্থাৎ বাম করতলের উপর কিছু তামাক পাতা এবং চুন রেখে দক্ষিণ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে নিবিষ্ট

চিত্তে মর্দন করছিলেন সেগুলি। তাঁর দুটি হাত এবং মন—কোনটাই দ্বাররক্ষায় ব্যাপৃত ছিল না।

হঠাৎ বামাকণ্ঠে ভুল হিন্দিতে শোনা গেল—"রাস্তা ছোড়িয়ে না। কেবাড়িকা পাশ সংকা মাফিক খাড়া হ্যা কাহে—। হটিয়ে হটিয়ে—"

দ্বারপ্রান্তে দেখা গেল একটি বলিষ্ঠা মহিলা গাড়ির হাতল ধ'রে ঝুলছেন। প্রকাণ্ড গোল মুখ, গোল গোল চোখ, চিবুকের তলায় দু' থাক চর্বি, নাকে নথ, নথে টানা। মাথার কাপড় খুলে পড়েছে, আলুলায়িত কুন্তল লুটিয়ে পড়ছে পিঠের উপর। সিঁথিতে জ্বলজ্বল করছে সিঁদুর।

"হটিয়ে হটিয়ে। ট্রেণ বেশী নেহ থামে গা, গার্ড সাহেব ঝণ্ডি দেখাতা হ্যায়। হটিয়ে না—"

সিপাহিজী এ মূর্তি দেখে ঘাবড়ে গিয়েছিলেন একটু। কারণ, তাঁর কণ্ঠস্বরে এবং মুখভাবে একটু কোমলতার আমেজ পাওয়া গেল।

"কুছভি জঘা নেই হ্যায় মাইজি—"

"আপ খোলিয়ে না, হটিযে না, হামলোক খাড়া হোকে যাঙ্গে। ই ট্রেণ ফেল করনে সে বাবুজিকা নোকরি চলা যাগা, কাল জয়েনিং তারিখ হ্যায়—হটিয়ে—"

"মগর "

মহিলা আর অধিক বাক্যব্যয় না করে কপাট ঠেলে ঢুকে পড়লেন। সিপাহিজী আর তাঁকে বাধা দিতে সাহস করলেন না। তাঁর ঈষৎ অনুকম্পাও হয়েছিল বোধহয়। কারণ পরে জানা গেল তিনিও ছুটির শেষে কাজে জয়েন করতে যাচ্ছেন। ছুটির শেষে কাজে জয়েন না করলে যে কি মর্মান্তিক ব্যাপার ঘটে তা তাঁর জানা ছিল।

কপাটটা ভাল ক'রে খুলে দিয়ে ভোজপুরী পুরুষপ্রবরকে স্থানচ্যুত করে ভদ্রমহিলা সমস্ত দরজাটি দখল করে' হাঁক দিলেন—"ওরে তোরা আয়, মণ্টু তুই আগে ওঠ, জিনিসপত্তরগুলো গোছাতে হবে, ঘণ্টু কোথা গেলি; শণ্টু মিণ্টু

কানটু, বানটু— আয় না তাড়াতাড়ি সব ওঠ, হাবলি ওদিকে হাঁ করে' দেখছিস কি, উঠে পড় না টপ করে—"

পিল পিল করে নানা বয়সের একদল ছেলেমেয়ে উঠে পড়লো। সরদারজি একটু এগিয়ে এসে বাধা দেবার চেষ্টা করলেন—"ইয়ে তো জুলুম্ কি বাত হ্যায় মাতাজি,—"

"আপ চুপ রহিয়ে"

ভদ্রমহিলার ধমকে সরদারজী থতমত খেয়ে স'রে দাঁড়ালেন।

"এই কুলি, ইধার ইধার—"

তোরঙ্গ, সুটকেস, হোলড্অল্, নানা আকারের পুঁটুলি, ঝুড়ি গোটা দুই, প্রকাণ্ড একটা টিফিন কেরিয়ার, গোটা চারেক হাঁড়ি, গোটা তিনেক প্রকাণ্ড তরমুজ, একটা বঁটি, তা ছাড়া একটা মুখ বাঁধা প্রকাণ্ড বস্তা··· ! প্রকাণ্ড কুঁজো !

ভদ্রমহিলা দরজা থেকে সরে দাঁড়ালেন, কুলিরা এইসব তুলতে লাগল।

"আওর দো কুলি উপর চলা আও, চীজ বাস্ সরিয়াকে রাখখো। ওই উধাবকা বাঙ্ক মে সব এলোমেলো হোকে হ্যায়, পহলে সব ঠিক কর দেও।···"

যে সব যাত্রীর জিনিস উক্ত বাঙ্কে ছিল তাঁরা শশব্যস্ত হয়ে পড়লেন। মুসলমান মৌলভীটি তাঁর ফেজ আর বদনাটি নামিয়ে নিজের কাছে রাখাই সঙ্গত মনে করলেন। ফেজটি শিরে ধারণ কবলেন, বদনাটি অঙ্কে। মাড়োয়ারি ভদ্রলোকও তাঁর ছোট ট্রাঙ্কটি কোথায় বাখবেন ভেবে বিব্রত বোধ করছিলেন, ভদ্রমহিলা আশ্বস্ত করলেন সবাইকে।

"সব ঠিক করকে গুছায়কে রাখ দেঙ্গে, আপলোক ঘাবড়াইয়ে নেই—"

সত্যিই দেখা গেল বাঙ্কের জিনিসপত্রগুলো অগোছাল হয়েই ছিল। গুছিয়ে রাখাতে অনেকখানি জায়গা বেরোল। আমাকে সম্বোধন করে' ভদ্রমহিলা বললেন, "খোকা, তুমি বাবা পা-টা গুটিয়ে বোস তো, হ্যাঁ,—ওইখানে হোল্ড্অল আর বোরাটা থাক, বেঞ্চি দুটোর ফাঁকে। ওগুলোর উপরেই তুমি পা রাখ। তুমি বাবা পা দুটো একটুখানি সরিয়ে নাও,—হ্যাঁ এইবার ঠিক হয়েছে" তারপর তিনি কামরাটার চারদিকে চেয়ে দেখলেন একবার।

"এই কুলি ট্রাঙ্কঠো ওই উধারকা কোণা মে লে চলো। দোনো বেঞ্চকা বিচ মে দে দেও। আপলোক মেহেরবানি করকে পয়ের মোড়কে বৈঠিয়ে—। শণ্টু মণ্টু ট্রাঙ্কের উপর গিয়ে ব'স তোরা।"

শৌখীন পাঞ্জাবী-গায়ে নীল চশমা পরা একটি ছোকরা কোণে বসে 'বসে' পা দুলিয়ে দুলিয়ে সিগারেট ফুঁকছিল। সে একটু ঝেঁজে বলে উঠল—"আপনি এমন ভাবে হুকুম করছেন যেন আমরা আপনার চাকর—"

"চাকর কেন হতে যাবে বাবা। তোমরা সব ছেলে। পা-টা গুটিয়ে বস লক্ষ্মীটি। হ্যাঁ, এই তো হয়ে গেল। সবাইকেই তো যেতে হবে। সব গুছিয়ে দিচ্ছি দেখ না, কারও কোন কষ্ট হবে না—। হ্যাঁ, ওই কোণে কুঁজোটা থাক"

তারপর একটু হেঁট হয়ে দেখলেন বেঞ্চির তলাগুলো সব খালি আছে কি না।

"মিণ্টু, পুঁটুলিগুলো আর তরমুজ তিনটে এই বেঞ্চের তলায় ঢুকিয়ে দে। আর ঘণ্টুকে কোলে করে তুই ওই কোণটায় চলে যা। ও বাবা পাগড়ি, মেয়েটাকে একটু দাঁড়াতে জায়গা দাও বাবা—"

একটি ক্রিশ্চান দম্পতি একটু বেশী জায়গা নিয়ে একধারে বসেছিলেন। ক্রিশ্চান ভদ্রলোকের সাহেবী পোষাক দেখে তাঁকে ঘাঁটাতে কেউ সাহস করে নি। ভদ্রমহিলা করলেন। তিনি কানটু আর বানটুকে চালান করে দিলেন সেদিকে।

"তোরা ওই দিকে গিয়ে মেম-মাসীমার কাছে বস গিয়ে। হাবলিও যা—"

ক্রিশ্চান দম্পতি আপত্তি করলেন না। ভ্যানিটি ব্যাগ, অ্যাটাশে কেস প্রভৃতি টুকিটাকি জিনিসগুলি সরিয়ে নিয়ে জায়গা করে' দিলেন শিশুগুলির। ক্রিশ্চান ভদ্রমহিলা তো বানটুকে কোলেই বসিয়ে নিলেন। ক্রিশ্চান ভদ্রলোকেরও শিভ্যলরি উদ্বুদ্ধ হ'ল সহসা। তিনি দাঁড়িয়ে উঠে ভদ্রমহিলাকে সম্বোধন করে' বললেন—"আপ ভি বৈঠ যাইয়ে। মায় খাড়া রহুঙ্গা।"

"না না, তুমি বাবা ব'স। আমার বসবার দরকার নেই। ওগো,

তুমি কোথা গেলে, এইবার তুমি ওঠ না, ওঠ, ওঠ, ট্রেণ আর কতক্ষণ দাঁড়াবে”

আড়ময়লা পাঞ্জাবীপরা ঝোলা-গোঁফ শীর্ণকান্তি একটি ভদ্রলোক উঠলেন।

“তুমি একটু জায়গা করে' নাও কোথাও—”

“ইউ কাম হিয়ার, দেয়ার ইজ্ এনাফ্ স্পেস—”

ক্রিশ্চান ভদ্রলোকের পাশে গিয়ে বসলেন তিনি।

আমি তখন ভদ্রমহিলাকে আহ্বান করলাম—“আপনি এসে এই হোল্‌ড্-অল্‌টার উপর বসুন। আমি পা গুটিয়েই বসছি—”

“তোমার কষ্ট হবে না তো বাবা”

“না, কিছুমাত্র না”

“আজকালকার ছেলেরা সোণার চাঁদ সব। হীরের টুকরো”

ভদ্রমহিলা এসে গদীয়ান হয়ে হোল্‌ড্-অল্‌টির উপর অধিষ্ঠিতা হলেন। সব যখন মোটামুটি ঠিক হয়ে গেছে তখন ভদ্রমহিলার নজরে পড়ল মিণ্টু ঘণ্টুকে কোলে করে' কোণঠাসা হয়ে আছে। দাঁড়িয়ে উঠলেন তিনি—“মিণ্টু তুই এসে এখানে ব'স। আমি দাঁড়িয়ে থাকছি”

“আপনি দাঁড়াবেন কেন। ওদের জায়গাও করে' দিচ্ছি। শেঠজি আপ থোড়া সে হাটকে বৈঠিয়ে।” শেঠজির মুখে একটু বিরক্তভাব ফুটে উঠল, কিন্তু তবু তিনি সরে বসলেন একটু। এতে কিন্তু সমস্যার সমাধান হল না। ওইটুকু জায়গায় ঘণ্টুকে কোলে নিয়ে মিণ্টুর বসা অসম্ভব। শেঠজির পাশেই বসেছিল একটি সাঁওতাল যুবক। বলিষ্ঠ কালো চেহারা, চোখে মুখে নির্ভীক সবলতা, একমাথা কালো ঝাঁকড়া চুল। তার দিকে চাইতেই সে উঠে পড়ল এবং দরজার ধারে গিয়ে সরদারজির পাশে দাঁড়াল। ঘণ্টুকে কোলে নিয়ে মিণ্টু বসল তার জায়গায়। সকলেরই স্থান সঙ্কুলান হয়ে গেল। আমি একটু বিস্মিত হচ্ছিলাম ট্রেণটা দাঁড়িয়ে আছে দেখে। এত ছোট ষ্টেশনে দুতিন মিনিটের বেশী দাঁড়াবার কথা নয়। কুলীরা পয়সা নিয়ে নেবে গেল।

তবু ট্রেণ ছাড়ে না। হঠাৎ দেখলাম স্টেশনমাষ্টার মশাই পা-দানির উপর দাঁড়িয়ে জানলা দিয়ে মুখ গলিয়ে দেখছেন।

"ও, আপনারা এইখানে উঠেছেন বুঝি। জিনিসপত্তর সব উঠে গেছে? বড্ড 'রাশ' আজকে। ট্রেণ তাহলে ছাড়ি?"

একমুখ হেসে ভদ্রমহিলা বললেন—"হ্যাঁ আমরা গুছিয়ে বসেছি। অনেক কষ্ট দিলুম বাবা আপনাকে, ভগবান আপনার মঙ্গল করবেন।"

"না, না, কষ্ট আর কি।"

নেমে গেলেন স্টেশন মাষ্টার।

তারপরই শোনা গেল—"অল্ রাইট, অল্ রাইট"

ট্রেণ ছাড়ল।

ভদ্রমহিলার এই অতর্কিত আক্রমণে অনেকেই অস্বস্তি বোধ করছিলেন। অসন্তুষ্টও হয়েছিলেন দু'একজন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে সব ঠিক হয়ে গেল।

ভদ্রমহিলা আমাকে বললেন—"ওই টিফিন কেরিয়ারটা বাঙ্ক থেকে নাবিয়ে দাও তো বাবা—"। নামালাম।

বিরাট টিফিন কেরিয়ার। বেশ ভারী।

টিফিন কেরিয়ারটি খুলে ফেললেন তিনি। দেখলাম, প্রচুর লুচি, তরকারি আর রসগোল্লা রয়েছে। ভদ্রমহিলা দু'খানি করে লুচি, একটু করে তরকারি এবং একটি ক'রে রসগোল্লা প্রত্যেককে বিতরণ করতে শুরু করলেন। দু'একজন নিতে আপত্তি করলে, কিন্তু কিছুতেই তিনি শুনলেন না।

"হাম আপকো মা-ই হ্যায়, লিজিয়ে, লজ্জা কি বেটা—"সকলকেই নিতে হল। সেই নীল চশমা পরা ছোকরাকে সম্বোধন করে তিনি বললেন—"তোমাকে বাবা একটু বেশী করে দিচ্ছি। ছেলেমানুষ তুমি, দুখানিতে তোমার কি হবে—"

ট্রেণ চলছে। মুখও চলছে প্রত্যেকের। সমস্ত কুয়াশা কেটে গেল। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আমরা সবাই আজ্ঞাবহ ভৃত্য হয়ে উঠলাম তাঁর এবং তিনিও অসঙ্কোচে হুকুম করতে লাগলেন সকলকে। কোনও ষ্টেশনে আমরা

তাঁর পান কিনে দিলাম, একটা জংসনে সকলকে চা খাওয়ালেন তিনি। সিপাহিজী আর একটা ষ্টেশনে রসগোল্লা কিনে আনলেন আবার। সর্দারজি কুঁজো হাতে ছুটলেন জল ভরতে। চানাচুরওলার কাছ থেকে চানাচুর কিনে আবার বিতরণ করতে লাগলেন তিনি সকলকে। সেই গরমে, সেই ভীড়ে, সেই থার্ডক্লাস গাড়িতে আনন্দের হিল্লোল বইতে লাগল।

পুকুরে

শামুক। আমার বিশ্বাস ভিতরে গলদ আছে।

গুগলি। গলদ তো আছেই, তা নাহলে নিজেদের সমাজ ত্যাগ করে কেউ!

পাঁক। যখনই দেখলাম ও বারফট্‌কা হয়েছে—তখনই বুঝলাম গতিক খারাপ।

চুনোমাছ। গোড়াতেই তোমার শাসন করা উচিত ছিল। তুমি হলে আমাদের সমাজপতি।

পুঁটিমাছ। সমাজপতি উনি কি শ্যাওলা সে বিষয়ে মতভেদ আছে, সেকথা থাক, কিন্তু ওঁরই শাসন করা উচিত ছিল, উনিই তো মানুষ করেছেন।

পাঁক। আমি শাসনের ত্রুটি করিনি ভাই। অনেক বুঝিয়েছি, অনেক বকা-ঝকা করেছি! কিন্তু জানই তো ভাই, আমি খুব বেশী কড়া হতে পারি না, আমি তো পাথর নই।

গুগলি। তুমি পাথর হলে আমরা কি বাঁচতাম! তোমাকে পাথর হতে হবে না, একটু রাশ টেনে ধর খালি।

ল্যাটা মাছ। এখন আর কিছু করা যাবে না!

শামুক। কিন্তু কিছু তো একটা করা উচিত। আমার বিশ্বাস ভিতরে ভীষণ একটা গলদ আছে।

মশার বাচ্ছা। আমি জানি কি হয়েছে। আমি তো ক্রমাগত নীচ থেকে উপরে যাচ্ছি। আমি জানি কি হয়েছে—

পাঁক। কি বল তো?

মশার বাচ্ছা। কতকগুলো বাজে মাছির সঙ্গে ভাব হয়েছে। তারা ওর কাছে ক্রমাগত ঘুরঘুর করছে—ভনভন করছে—

গুগলি। তাই নাকি! আমার মাঝে মাঝে কিন্তু সন্দেহ হয় মাথাই খারাপ হয়ে গেছে ওর। কেমন ক'রে যেন চেয়ে থাকে উপর দিকে মুখ করে'। মাঝে মাঝে দোলে—

চুনো। এ সব দুর্লক্ষণ!

পুঁটি। এ আমরা সহ্য করব না। পাঁক যদি এর কোনও ব্যবস্থা না করতে পারে আমরা শ্যাওলার শরণাপন্ন হব। এ রকম বেলেল্লাপনা বরদাস্ত করা অসম্ভব। [গুগলিকে] যা ভাবছ তা মোটেই নয়, মাথা টাথা কিছুই খারাপ হয়নি। ওসব ন্যাকামি' ঢং —

ন্যাটা মাছ কিছু না বলে হাসলেন।

দ্বিতীয় মশার বাচ্ছা। [চুপি চুপি] আমি কিন্তু শুনেছি ও নাকি একটা মেয়েমানুষের পাল্লায় পড়েছে।

শামুক। ওই শোন!

গুগলি। তাই নাকি ?

দ্বিতীয় মশার বাচ্ছা। [চুপি চুপি] হ্যাঁ গো, আলো তার নাম!

শামুক। আমি তো বলেছিলুম ভিতরে গলদ আছে।

পুকুরের জল। আমি এতক্ষণ কিছু বলিনি। তোমাদের কথা শুনছিলাম খালি। তোমরা কেউ কিচ্ছু জান না। আসল ব্যাপারটি শোন তাহলে। ওর মাথাও খারাপ হয়নি, প্রেমেও পড়েনি। ও পাগলও নয়, প্রেমিকও নয়, ও বিশ্বাসঘাতক। ও ষড়যন্ত্র করছে। কার সঙ্গে জান ? সূর্যের সঙ্গে, যে সূর্য প্রতিমুহূর্তে আমাকে শোষণ করছে—

এই ভীষণ সংবাদে সকলে স্তম্ভিত হয়ে গেল।

চুনো। কি করা যায় তাহলে ?

পুঁটি। কেন, আন্দোলন! আন্দোলন করলে কি না হয়। দেখতে দেখতে বাছাধন ঠাণ্ডা হয়ে যাবেন—

সকলে সমস্বরে। বেশ তাই হোক তবে।

আন্দোলন সুরু হয়ে গেল।

পাঁক ঘুলিয়ে উঠল।

কমল ফুল কিন্তু যেমন বিকশিত হয়ে ছিল, তেমনি বিকশিত হয়েই রইল।

———

থাপ্‌পোড়

সন্ধ্যার সময় যে রোগীটির বাকী 'ফি' দিয়ে যাবার কথা সে এল না। মনটা খারাপ হয়ে গেল; ওষুধের দাম বা 'ফি' বাকী পড়লে তা আর সহজে আদায় হয় না। বেশী তাগাদা করলে লোকে বলে চামার। সুতরাং তা-ও করা যায় না। যিনি 'ফি' বা ওষুধের দাম বাকী রেখেছেন, তাঁরও একটা চক্ষুলজ্জা আছে, সুতরাং তিনিও যথাসাধ্য এড়িয়ে চলতে চান। রাস্তায় দেখা হলে হয় ভাণ করেন যেন আমাকে দেখতে পান নি বা পট্ করে' পাশের গলিতে ঢুকে পড়েন। পুনরায় যখন ওষুধ বা ডাক্তারের দরকার হয়, তখন আমার কাছে আর আসেন না, আর কারও শরণাপন্ন হন। মানুষের অকৃতজ্ঞতায় মন বিষিয়ে ওঠে। ভদ্রলোকের বাড়িতে উপর্যুপরি চারদিন দু'বেলা গেছি, একটি পয়সা দেন নি এখনও। আজ বলেছিলেন নিশ্চয় দিয়ে যাব, কিন্তু কই এখনও তো দেখা নেই। রাত ন'টা হয়ে গেল, একটা খবর পর্যন্ত দিলেন না ভদ্রলোক। কি দেশেই জন্মগ্রহণ করেছি! উঠব উঠব করছি এমন সময় দ্বারপ্রান্তে গণেশদা দেখা দিলেন। গণেশদা বেকার লোক। অনেক দিন হল চাকরি থেকে রিটায়ার করেছেন। স্ত্রী মারা গেছেন অনেক দিন আগে, ছেলেমেয়েদের যা হোক হিল্লে হয়ে গছে, সুতরাং তাঁর এখন নিজের কোনও কাজ নেই। অপরের হাঁড়ির খবর নেওয়া, নিম্নকণ্ঠে এর কথা ওর কাছে বলা, নানাবিধ গুজব সংগ্রহ করে সেগুলি প্রচার করা, কোন মন্ত্রী কি করছে তা নিয়ে মাথা ঘামানো—এই সব নিয়েই থাকেন তিনি আজকাল। অর্শ গেঁটে বাত, একজিমা প্রভৃতি কয়েকটি পোষা ব্যাধি আছে তাঁর। এর মধ্যে যেটা যখন চাগায় আমার কাছে এসে ওষুধ নিয়ে যান। বলা বাহুল্য, বিনা মূল্যে।

গণেশদা এসেই বললেন, "ডাক্তারি করা ছেড়ে দাও, রোগ ধরতে পার না,

আপ-টু-ডেট ওষুধের নাম জান না,—ডাক্তারি করার দরকার কি” বলেই তিনি হেসে ফেললেন।

“কেন, কি হয়েছে—”

“মিত্তিরদের বাড়ির ছেলেটাকে তুমি দেখছিলে কি ?”

“গত চারদিন থেকে দেখছি! এখনই তাদের বাড়ি থেকে লোক আসবার কথা, ফি বাকী আছে—”

“আর তারা আসবে না, সিভিল সার্জনকে ডেকেছে। বলে’ বেড়াচ্ছে তুমি না কি রোগ ধরতে পার নি—”

“সত্যি ?”

“স্বকর্ণে শুনে এলাম।”

রাগে আপাদমস্তক জ্বলতে লাগল। কিন্তু বাইরে সে ভাব প্রকাশ করলাম না।

মৃদু হেসে কেবল বললাম, “ভাল।”

গণেশদা ক্ষণকাল চুপ করে’ থেকে বললেন, “আমার অর্শটা আবার কাল থেকে খুব বেড়েছে, বুঝলে—দেবে না কি কিছু একটা—”

কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে’ থেকে উত্তর দিলাম, “দিতে পারি যদি ওষুধের নগদ দাম দেন। এদেশে কারও উপকার করবার প্রবৃত্তি আর নেই।

“ও বাবা, একবারে সপ্তমে চড়ে’ গেলে যে! আজ তাহলে যাই, শেঁক-টেক দিই গে। কাল আসব। আশা করি ততক্ষণে মাথা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে—”

গণেশদা মুচকি হেসে চলে গেলেন।

গুম হয়ে বসে রইলাম খানিকক্ষণ।

“কম্পাউণ্ডার বাবু, ওষুধের বিল সবসুদ্ধ কত বাকি আছে দেখুন তো—”

“প্রায় আড়াই শ’ টাকা হবে”

“কাল তাগাদায় পাঠিয়েছিলেন ?”

“পাঠিয়েছিলাম”

"আদায় হয়েছে কিছু ?"

"না"

"নালিশ করব ব্যাটাদের নামে। সব জোচ্চোর, অকৃতজ্ঞ—"

কম্পাউণ্ডার নীরব।

"দেখুন, কম্পাউণ্ডারবাবু, আপনি নিজে কাল একবার বেরিয়ে মিত্তিরদের ওখানে আমার বিলটা দিয়ে আসবেন। চার দিনের ফি বত্রিশ টাকা, আর ওষুধের দাম—"

"যে আজ্ঞে—"

"আশ্চর্য দেশে জন্মেছি! একটি ভদ্রলোক নেই, সব জোচ্চোর, ধড়িবাজ আর নিমকহারাম—"

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই থাপ্পোড়টি খেলাম।

দ্বারপ্রান্তে একটি যুবক এসে দাঁড়াল। কখনও দেখেছি বলে' মনে হল না।

"এইটেই কি ডাক্তার সামন্তের ডিসপেন্সারি ?"

"হ্যাঁ—"

"ডাক্তার সামন্ত কোথায়।"

"আমিই ডাক্তার সামন্ত। কি দরকার বলুন।"

যুবকটি একটু ইতস্তত করতে লাগল। মনে হল যেন লজ্জিত এবং অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছে। তারপর ঘরে' ঢুকে প্রণাম করলে আমাকে।

"আমি রতনদীঘি থেকে আসছি—"

প্রথম পাশ করেই রতনদীঘি গ্রামে প্রাকটিস করব বলে' বসেছিলাম। বছরখানেক সেখানে ভ্যারেণ্ডা ভেজে চলে' এসেছিলাম প্রায় তিরিশ বছর আগে। সেখান থেকে এতদিন পরে কে এল!

"আপনাকে ঠিক চিনতে পারছি না তো।"

মৃদু হেসে যুবক বললে, "চেনবার কথা নয়। আমার মা-কে হয়তো চিনতে পারেন। আমার মায়ের নাম রাসমণি। আমি যখন হই তখন মায়ের বড় কষ্ট হয়েছিল, আপনি না থাকলে মা বোধহয় বাঁচতেন না।"

সমস্ত ঘটনা মনে পড়ে গেল। ষোল সতের বছরের একটি প্রসবযন্ত্রণাতুরা নববধূর আর্ত মুখ ফুটে উঠল মানসপটে।

...রাসমণিও আমাকে একটি পয়সা দেয় নি, বলেছিল, "আপনার ঋণ শোধবার নয় ডাক্তারবাবু। তবু কিছু প্রণামী আমি নিশ্চয়ই পাঠিয়ে দেব আপনাকে যেমন করে' হোক। বিশ্বাস করুন আমার কথা—"

একটু ইতস্তত করে' যুবকটি বললে—"মা বছর দশেক হল মারা গেছেন। মরবার সময় বলে গিয়েছিলেন আমি নিজে রোজগার করে' অন্তত একশ' টাকা যেন আপনাকে দিয়ে আসি। আপনার আশীর্বাদে রোজগার কিছু কিছু হচ্ছে, তাই এই সামান্য কিছু এনেছি--"

একটি হাজার টাকার নোট আমার হাতে দিয়ে যুবকটি কাচুমাচু হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

"আপনার ঠিকানা খুঁজে বার করতে দেরি হল। তা না হলে আমি আগেই আসতাম।"

——

প্রেরণা

১

হরিরঞ্জনবাবু কাছারী থেকে ফিরে সেদিনও যখন দেখলেন যে, তাঁর পুত্র গোপাল লেখাপড়া কিচ্ছু করেনি, ঘুড়ি-লাটাই নিয়ে কাটিয়েছে, তখন তিনি আর আত্মসম্বরণ করতে পারলেন না, ছাতা নিয়ে তেড়ে গেলেন। নিক্ষিপ্ত ছাতাটিকে এড়িয়ে গোপাল যেই পালাতে যাবে, অমনি হরিরঞ্জনবাবু ধরে ফেললেন তাকে। মিনিট তিনেকের মধ্যেই হরিরঞ্জনবাবু মুক্তকচ্ছ এবং গোপাল অশ্রুসিক্ত হয়ে গৃহস্থালী-কাব্যের যে নূতন পর্বের সূচনা করছিলেন, অপ্রত্যাশিত-ভাবে তার রূপ বদলে গেল। গেটে মোটরের হর্ন শোনা গেল এবং হরিরঞ্জন-বাবু উঁকি দিয়ে দেখলেন যে, তাঁর ওপর-ওলা নব-নিযুক্ত ছোকরা জজ সাহেবের গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং উষ্মা দমন করে কাছাটি গুঁজে হাসিমুখে বেরিয়ে আসতে হল তাঁকে। এই জজ সাহেবেরই আপিসের কেরাণী তিনি। জজ-সাহেবটি সম্প্রতি বদলি হয়ে এসেছেন এখানে। বয়স যদিও কম কিন্তু ছেলে নাকি খুব ভালো। চাকরির পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন না কি। কড়া মেজাজের লোক, কোথাও (বিশেষ) যান না। কিন্তু হরিরঞ্জন-বাবুর সঙ্গে যেচে আলাপ করেছেন, এই নিয়ে তিনবার এলেন তাঁর বাড়িতে। "নমস্কার। গোপালের কান্না শোনা যাচ্ছে যেন। ব্যাপার কি—"

"আজ্ঞে না, ও কিছু নয়—"

"শাসন হচ্ছিল বুঝি—"

জজসাহেব বারান্দায় উঠলেন এসে।

"পড়াশোনায় একদম মন নেই সার। কেবল ঘুড়ি আর লাটাই। আমাদের দাইয়ের একটা ছেলে জুটেছে তার সঙ্গে সমস্তদিন মাঠে মাঠে টো-টো করে বেড়াবে। একটিবার বই ছোঁবে না।"

"বটে—"

গোপাল ঘাড় হেঁট করে প্রাণপণে চোখ কচলাচ্ছিল দু'হাত দিয়ে। জজসাহেব তার মাথায় হাত বুলিয়ে স-স্নেহে বললেন, "কিসের মাঞ্জা দিলে ঘুড়ির সুতো মজবুত হয় বল তো ?"

চোখ কচলাতে কচলাতেই ক্রন্দন-কম্পিত স্বরে গোপাল উত্তর দিলে— "বেলের আঠা আর কাঁচের গুঁড়ো।"

"আচ্ছা, আরও একরকম ভালো মাঞ্জা তোমাকে শিখিয়ে দেব আমি—"

গোপাল আড়চোখে জজসাহেবের দিকে চেয়ে ফিক করে হেসে এক ছুটে চলে গেল বাড়ির ভেতর।

"মা, জজসাহেব আবার এসেছে আজ মোটরে করে'। কি চমৎকার মেটরটা মা—"

"দেখেছি।"

হরিরঞ্জনবাবু সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করলেন, "গরীবের বাড়িতে এক কাপ চা খাবেন সার ? ক'রে আনতে বলি ?"

"চা আমি খেয়ে বেরিয়েছি। তা বলুন, খাওয়া যাক আর এক কাপ—"

হাতল-ভাঙা কাঠের চেয়ারটা তাড়াতাড়ি এগিয়ে দিলেন হরিরঞ্জন। "বসুন সার। এক্ষুনি করে এনে দিচ্ছি।"

শশব্যস্ত হরিরঞ্জন দ্রুতপদে বাড়ির ভিতর ঢুকে গেলেন। "শুনছ মিনু, জজসাহেব চা খাবেন। চট করে করে দাও দিকি এক কাপ। সেদিন যে নতুন টি-পটটা কিনেছি সেইটেতেই কোরো, বুঝলে। গোপ্‌লা গজুবাবুর বাড়ি থেকে ভাল একটা চায়ের পেয়ালা চেয়ে আন্‌ দিকি। খিড়কি দিয়ে যা, উনি যেন দেখতে না পান—"

২

চা পর্ব শেষ হয়ে গেল।

গোপালের পাঠে অমনোযোগের কথাই আলোচনা হচ্ছিল। হরিরঞ্জনবাবু

ব'লছিলেন যে, পয়সার জোর থাকলে তিনি একজন প্রাইভেট টিউটার রাখতে পারতেন। তাহলে হয়তো কিছু কাজ হ'ত।

জজসাহেব হেসে বললেন, "তার কোনও মানে নেই হরিবাবু। একটা গল্প বলি তাহলে শুনুন। গল্প নয়, সত্যি ঘটনা। একটি ভদ্রলোকের ছেলে ছিল দুটি। তারা যেন প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, কিছুতেই লেখাপড়া করবে না। তাদের বাবা মাস্টারের পর মাস্টার বদলাতে লাগলেন, স্কুলের পর স্কুল বদলাতে লাগলেন, কোনও ফল হল না। রোজ তারা স্কুল পালাত; বাড়িতে প্রাইভেট টিউটার পড়াব প্রসঙ্গ তুললেই সবে পড়ত, মায়ের আদুরে ছেলে, গায়ে হাত তোলবারও উপায় ছিল না কোনও মাস্টারের। তবু একজন মাস্টার বিরক্ত এবং মরিয়া হযে গোবেড়েন করেছিলেন তাদের। কিন্তু কোনও ফল হয় নি। বাপের পয়সার অভাব ছিল না। তিনি শেষকালে কাগজে এই মর্মে বিজ্ঞাপন দিলেন যে, যে শিক্ষক আমার ছেলেদের পড়ায় মন বসিয়ে দিতে পারবেন, মাসিক বেতন ছাড়া তাঁকে নগদ একশত টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। জুটল একজন ছোকবা শিক্ষক। তিনি প্রথম প্রথম এসে পড়াশোনার কথাই তুললেন না। গুলি খেলা, ঘুড়ি ওড়ানো, কাগজেব নৌকা তৈরী করা এইসব নিয়ে ভুলিযে বাখতেন ছেলে দুটিকে। কিছুদিন কাটল। তারপব মাস্টার ছেলেদের নিযে মাঠে বেড়াতে গেলেন একদিন। সবে সন্ধ্যা হয়েছে। দু'একটি তারা উঠেছে আকাশে। মাস্টার একটি তারা দেখিয়ে বললেন, "ওই দেখ একটি তাবা উঠেছে।"

বড় ছেলেটি বললে—"ওই যে আর একটা—"

"ক'টা হল, তাহলে।"

"দুটো—"

"ওই দেখ আর একটা। কটা হ'ল।"

"তিনটে। ওই এদিকে আর একটা সার।"

"কটা হ'ল?"

"চারটে—"

"ওই পাঁচটার উপর দেখ আর একটা। চার আর একে পাঁচ হল তাহলে? কি বল?"

"হ্যাঁ স্যর।"

ছোট ছেলেটি এতক্ষণ একটি কথা বলে নি।

সে দাদার দিকে চেয়ে বললে, "দাদা মাস্টার কিন্তু পড়াচ্ছে—"

বলেই সে ছুটল বাড়ির দিকে। দাদাও ছুটল তার পিছু পিছু। মাস্টার সেইখান থেকেই বিদায় নিলেন। তাঁর দৃঢ় ধারণা হল এ ছেলেদের কিছু হবে না।"

জজসাহেব চুপ করলেন।

"তারপর?"

"বড় ছেলেটি কলেরায় মারা গেল দিন কতক পরে। ফলে ছোট ছেলেটি আরও আদুরে হয়ে উঠল। পড়াশোনার ধাব দিয়েও আর যেত না-সে।"

আবার চুপ করলেন জজসাহেব।

"অত আদর দিলে কি আর লেখাপড়া হয় সাব?" আদরের অপকারিতা বিষয়েই জজসাহেব বলছেন ভেবে কথাগুলি বললেন হরিরঞ্জন।

জজসাহেব বললেন—"অত আদর সত্ত্বেও কিন্তু ছেলেটির লেখাপড়ায় মন বসল হঠাৎ একদিন। টপাটপ পরীক্ষা পাশ করতে লাগল সে।"

"তাই না কি!"

"হ্যাঁ। কখন কিভাবে যে কি হয় তা বলা যায় না।"

"আজ্ঞে সার, তা তো বটেই, তা তো বটেই।"

"আচ্ছা এবার উঠি আমি। এমনিই এসেছিলাম। আপনার বাড়ির সব খবর ভালো তো—"

"আজ্ঞে হাঁ"

জজ সাহেব চলে গেলেন। তিনি যে গল্পটি বললেন সেটি অসম্পূর্ণ। তার শেষের অংশটুকু ইচ্ছে করেই চেপে গেলেন তিনি। সে অংশটুকু হচ্ছে এই যে,

পাশের বাড়ির ন'বছরের মেয়ে মিনুর সঙ্গে খুব ভাব হয়েছিল ছেলেটির। আড়ালে তাকে সে একদিন নাকি বলেছিল—মিনু, আমাকে যদি তুই বিয়ে করিস বেশ হয়। করবি? উত্তরে মিনু বলে, তোমার মতো মুখ্যু ছেলেকে আমি বিয়ে করতে যাব কোন দুঃখে? আমার বর হবে বিদ্বান। তারপর থেকেই নাকি ছেলেটির পড়ায় মন বসে। আর একটা কথাও তিনি বলেননি। ছেলেটি অপর কেউ নয়, তিনি নিজেরই বাল্য কাহিনী বিবৃত করছিলেন।

—

লাল কালো

বাবা পক্ষাঘাতগ্রস্ত, মা পাগল, ম্যাট্রিক ফেল দাদা চাকরির চেষ্টায় ঘুরে বেড়ায়, আট বছরের ছেলে টুনুই সংসার চালায় ভিক্ষে করে। ভিক্ষে করে প্রায় বারো আনা রোজকার করে সে। সকালে উঠেই বেরিয়ে পড়ে, প্রতি দ্বারে দ্বারে হাত পাতে, প্রতি পথিকের করুণা উদ্রেক করবার চেষ্টা করে। কেউ পয়সা দেয়, কেউ গালাগালি দেয়, উপদেশও দেয় কেউ কেউ।

টুনুর বাঁধা ঘর আছে কয়েকটি! সকলেই মধ্যবিত্ত গৃহস্থ। বড়লোকের বাড়ির দিকে বড় একটা ঘেঁসে না সে। তাঁদের মধ্যে দয়ালু লোক হয়তো আছেন, কিন্তু তাঁদের বড় গেট পেরিয়ে তাঁদের কাছাকাছি যাওয়াই শক্ত! গেটে দারোয়ান থাকে, কুকুরও থাকে।

টুনুর বাঁধা ঘরের মধ্যে নানা জাতের লোক আছে। হিন্দু মুসলমান, মাড়োয়ারি, বেহারী ডাক্তার, দোকানী, উকীল, কেরাণী—সব রকম। সে সকলেরই ধাত চিনত। চিনতে পারেনি কেবল রামচরণবাবুকে। ওই উস্‌কো-খুস্‌কো-চুল রক্তচক্ষু লোকটির চরিত্র খুবই অদ্ভুত মনে হত তার কাছে। প্রতিদিনই তার একটা অপ্রত্যাশিত নূতন রূপ যেন দেখতে পেত সে। রামচরণবাবু রোজই যে তাকে পয়সা দিতেন তা নয়, কিন্তু টুনু রোজই যেত তাঁর কাছে—হয়তো তাঁর অপ্রত্যাশিত রূপ দেখবে বলেই। সন্ধ্যার সময় সে যেত রোজ। গিয়ে কোনদিন দেখত রামচরণবাবু নিবিষ্টচিত্তে পড়ছেন। টুনু যদি বুঝতে পারত রামচরণবাবু কি পড়ছেন তাহলে সে আরও আশ্চর্য হয়ে যেত এই ভেবে যে, রামচরণবাবু প্রতিদিনই নূতন রকম বই পড়েন, কোনদিন গীতা, কোনদিন ডিটেকটিভ নভেল, কোনদিন কোনও রাজনৈতিক নেতার বক্তৃতা, কোনদিন বা পাঁজি, কোনওদিন বা রেলোয়ে টাইমটেবল। টুনু দেখত রামচরণবাবু পড়ছেন এবং তাঁর ভুরু কুঁচকে আছে, যেন তিনি যেটা

পড়ছেন সেটাকে ঈষৎ বিরক্তিমিশ্রিত সন্দেহের চক্ষে যাচাই করে নিচ্ছেন মনে মনে। টুনুর সঙ্গে চোখোচোখি হলেই একটা পয়সা বা ডবল পয়সা বা আনি যা হাতের কাছে পেতেন ছুঁড়ে দিতেন। কোনওদিন হয়তো যাওয়ামাত্র খেঁকিয়ে উঠতেন—"আবার এসেছে হারামজাদা। যেন বাপের জমিদারী!" টুনু বুঝত আজ সুবিধে হবে না, সরে' পড়ত সুট করে। কোন কোন দিন সরে পড়বার মুখেও রামচরণবাবুর নূতন একটা মূর্তি চোখে পড়ত তার। রামচরণবাবু দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বলে' উঠতেন, 'আবার অভিমান করে চলে যাওয়া হচ্ছে লবাবপুত্তুরের। যা, নিয়ে যা'—ঠক্ করে' একটা আনিই হয়তো এসে পড়তো পায়ের গোড়ায়। কোনদিন টুনু হয়তো গিয়ে দেখত রামচরণবাবু গলার সামনের দিকটায় হাত বুলুতে বুলুতে কড়িকাঠ গুনছেন। টুনু সঙ্কুচিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকত চুপ করে। টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করত না। তারপর হঠাৎ যখন রামচরণবাবুর সঙ্গে চোখোচোখি হয়ে যেত রামচরণবাবু অপ্রস্তুত হয়ে পড়তেন। যেন চুরি করে' কিছু একটা করছিলেন, ধরা পড়ে গেছেন। অপ্রতিভ হাসি হেসে বলতেন, "ও তুই, কতক্ষণ এসেছিস'—তাড়াতাড়ি একটা পয়সা ছুঁড়ে দিতেন। রামচরণবাবুর নানা মূর্তি দেখেছিল টুনু। মাঝে মাঝে দেখত রামচরণবাবু একটা বোতল আর গ্লাস নিয়ে বসে আছেন। মেজাজ দিলদরিয়া। টুনুকে দেখবামাত্র বলে উঠতেন 'এস এস বাবা এস। তোমার অপেক্ষাতেই বসে' আছি'—হয়তো একটা গোটা দু-আনিই পেয়ে যেত সেদিন টুনু। টুনু রামচরণবাবুর জীবনকথা কিছুই জানত না। জানত না যে, তাঁর স্ত্রী তাঁকে ছেড়ে পালিয়ে গেছে আর একজনের সঙ্গে প্রায় কুড়ি বছর আগে। জানত না যে শিশু পুত্রটিকে সে ফেলে গিয়েছিল এবং যাকে কেন্দ্র করে' রামচরণবাবুর কল্পনা স্বপ্নের রঙীন প্রাসাদ সৃষ্টি করছিল সেই ছেলেটি যক্ষ্মারোগে মারা গেছে কিছুদিন আগে। এসব সে কিছুই জানত না, সে রামচরণের টুকরো টুকরো নানা ছবি জুড়ে জুড়ে এক নূতন রামচরণ সৃজন করেছিল নিজের মনে। এবং তাকে ভালও বেসেছিল।

২

কিছুদিন থেকে টুনু লক্ষ্য করছিল রামচরণবাবু ক্রমশঃ বেশী তিরিক্ষি হয়ে উঠছেন। মাঝে মাঝে এক আধটা পয়সা দেন বটে কিন্তু প্রায়ই তাড়িয়ে দেন। বোতল গ্লাস নিয়েও বসেন না আজকাল। গুম হয়ে বসে গলার সামনের দিকটায় হাত বুলোতে বুলোতে কেবল কড়িকাঠ গোণেন।

তারপর একদিন সে কার মুখে যেন শুনলে যে, রামচরণবাবুর অবস্থা না কি খারাপ হয়ে গেছে খুব। ঋণে আকণ্ঠ ডুবে গেছেন ভদ্রলোক। টুনুর মনে হল তাই বোধ হয় মদ কিনতে পারছেন না আজকাল, আর সেইজন্যেই মেজাজটা উগ্র হয়ে উঠছে বোধ হয়। রামচরণবাবুর দিলদরিয়া মেজাজের ছবিটা ফুটে উঠল তার মানসপটে। মনে হল তার যদি পয়সা থাকত তাহলে সে নিশ্চয়ই এক বোতল মদ কিনে দিয়ে আসত তাঁকে। মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথাও তার মনে খেলে গেল বিদ্যুদ্বেগে। তারা যেখানে থাকে তার ঠিক সামনেই থাকে বিনোদ সাহু। সে লোকটাও মদ খায়। অত্যন্ত পাজি লোক। টুনু তার কাছে গালাগালি ছাড়া আর কিছু পায়নি কোনদিন। মদ খেয়ে রামচরণবাবুর মতো দিলদরিয়া হতে পারে না সে। তার বাড়ির সামনের দরজাটা প্রায়ই খোলা থাকে। টুনু ইচ্ছে করলে তার বাইরের ঘর থেকে একটা বোতল অনায়াসেই সরিয়ে ফেলতে পারে। বাইরের ঘরের তাকের ওপর একটা বোতল তো থাকেই, রাস্তা থেকেই দেখতে পায় টুনু। অনায়াসেই তো বোতলটা পাচার করতে পারে সে। আহা, যদি পারে···রামচরণবাবুর জন্যে সত্যিই কষ্ট হয় টুনুর।

৩

রামচরণবাবু নিবিষ্টচিত্তে বসে বসে কড়িকাঠ গুণছিলেন, এমন সময় খুট করে' শব্দ হল কপাটের কাছে।

"কে রে—"

চেঁচিয়ে উঠলেন রামচরণবাবু।

"আমি"

বোতল হাতে এগিয়ে এল টুনু।

"ফের শালা তুই জ্বালাতে এসেছিস, বেরিয়ে যা এখান থেকে—"

টুনু যা কোনও দিন করেনি তাই করল সেদিন। ঘরের ভিতর ঢুকে টেবিলের উপর বোতলটা রেখে বলল, "এইটে আপনি খান—"

"খাব? মানে?"

বোতলটা তুলে দেখলেন রামচরণবাবু। মদের বোতল্ নয়, কালীর বোতল।

পরমুহূর্তেই আর্তনাদ করে উঠল টুনু। বোতলটা ছুড়ে মেরেছেন তাকে রামচরণবাবু। মাথা বোতল দুই-ই ফেটেছে। রক্তের লালের সঙ্গে কালীর কালো মিশে অদ্ভুত হয়েছে টুনুর মুখটা। রামচরণবাবু হতভম্ব হয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলেন। ভীড় জমতে লাগল।

নির্বাকের দুঃখ

রাগের আসল হেতুটা অবশ্য অন্য ছিল। নরেন বেশী রোজকার করে, মোটরকার কিনেছে, তার বউ বেশী সুন্দরী, বড়লোকের মেয়ে, পণে অলঙ্কারে আসবাবে প্রায় হাজার পঁচিশেক টাকা এনেছে বাপের বাড়ি থেকে ; এর প্রত্যেকটি অদৃশ্য কণ্টকরূপে বিঁধছিল হরেনের বুকে। কিন্তু বিঁধলে কি হবে, এর কোনটার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে' তো ফল হবে না। অনেকদিন আগেই বাড়ি ঘর বিষয় সম্পত্তি ভাগাভাগি হয়ে গেছে। নরেন তার ভাগের একতলা ঘরটার উপর উপর্য্যুপরি দুটো ঘর তুলে তিনতলা করেছে সেটাকে। ফলে হরেনের ভাগের উঠোনটা অন্ধকার হয়ে গেছে। নরেনের বউ তেতলার ঘরে বসে' গাঁক গাঁক করে' রেডিও বাজায়। হরেনের স্ত্রী ক্ষেমঙ্করীর বুক জ্বলে তাতে। রাগের আসল কারণ এই সব। কিন্তু এ সব কথাতো আদালতে গিয়ে বলা যায় না। তাই মকোর্দমাটা বাধল একটা কাঁঠাল গাছ নিয়ে। কাঁঠালগাছটা নরেনেব ভাগে পড়েছিল। তারপরই পাঁচিল এবং ঠিক পাঁচিলের ওপারে হরেনের একটা ঘর। সেই ঘবের জানলায় কাঁঠাল গাছের একটা ডাল গিয়ে পড়েছিল। ডালটা যেন বলতে চাইছিল, "ও হরেন, কেন দুই ভায়ে ঝগড়া করছ তোমবা। কেন মন গুমরে আছ, যেমন ছিলে তেমনি থাক না—"

কিন্তু এ ভাষা শোনবার মতো কান হরেনের ছিল না। সে একটা কাটারি নিয়ে এসে ডালটাকে কেটে দিলে। তারপর নরেনকে বললে, "দেখ, তোমার ওই কাঁঠাল গাছ থাকতে আমার ঘরটায় আলো হাওয়া কিছু ঢোকে না, আর ওইটি আমার একমাত্র শোবার ঘর, ও গাছ কেটে ফেল তুমি"

নরেন রাজি হল না। হরেন উকিলের পরামর্শ নিয়ে আদালতে এই মর্মে নালিশ করে' দিলে যে ও গাছ কেটে না ফেললে আমি যক্ষ্মারোগাক্রান্ত হয়ে' মারা যাব। আমার রোজ সন্ধ্যায় জ্বর হয়, ডাক্তার সন্দেহ করছেন যে

আমার বুকের দোষ হয়েছে। তিনি যে সব দামী ওষুধের ব্যবস্থা করেছেন তা কেনবার সামর্থ্য নেই আমার। ভগবানের দাম আলো হাওয়াটুকুও যাতে আমি নির্বিঘ্নে পাই তার জন্যে আমি প্রার্থনা করছি ওই কাঁঠালগাছটি কেটে ফেলবার হুকুম যেন আদালত দেন। গাছের যা ন্যায্য মূল্য তা আমি দেব।

বলা বাহুল্য, হরেনের যক্ষ্মা হয় নি, হয়েছিল রাগ। কিন্তু উকিলের পরামর্শ অনুসারে এবং ডাক্তারের সার্টিফিকেটের জোরে নিজেকে সে যক্ষ্মাগ্রস্ত বলে প্রমাণ করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কারণ উকিল বললেন তা না করলে ওই কাঁঠাল গাছ সরানো যাবে না।

আদালতে উকিল যক্ষ্মা সম্বন্ধে মর্মস্পর্শী বক্তৃতা করে' মহামান্য বিচারকের কাছে সুবিচার প্রার্থনা করতে লাগলেন।

পাড়ার লোকেরা কেউ হরেনের কেউ নরেনের পক্ষ অবলম্বন করে' গুজগুজ ফুসফুস শুরু করলেন। তাঁদের সময় বেশ কাটতে লাগল। আদালতেও ধাওয়া করতে লাগলেন কেউ কেউ টাটকা খবর সংগ্রহ করবার জন্যে। যাঁরা নিরপেক্ষ রইলেন তাঁরা বললেন—ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া, কি ট্র্যাজেডি! আসল ট্র্যাজেডির খবর কিন্তু রাখলে না কেউ। একটি নয়, তিনটি মর্মান্তিক ঘটনা ঘটল এর ফলে। হরেনবাবুর প্রথম পক্ষের একটি কুৎসিত মেয়ে ছিল। বয়স প্রায় বাইশ তেইশ। কিছুতেই কোথাও তার বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছিল না। টাকারও জোর নেই, রূপেরও জোর নেই। তার মামারা অবশেষে একটি দোজবরে ছেলের সঙ্গে তার বিয়ে প্রায় ঠিক করে' এনেছিলেন এবং তাকে ঘিরেই মান্‌তির কল্পনা রঙীন হয়ে উঠেছিল গোপনে গোপনে। কিন্তু যেই পাত্রপক্ষ শুনলেন হরেন যক্ষ্মাগ্রস্ত অমনি তাঁরা পিছিয়ে গেলেন। মানতির রঙীন কল্পনা মিলিয়ে গেল মরীচিকার মতো।

দ্বিতীয় ট্র্যাজেডি ঘটল চাঁদনকে কেন্দ্র করে'। নরেনের বাড়ির ঝি লক্ষ্মীর ছেলে চাঁদন ওই কাঁঠালগাছটির তলায় যেন স্বর্গলোক আবিষ্কার করেছিল। তার মা তাকে যখন বস্তির অন্ধকার ঘুপচি ঘর থেকে বার করে'

এনে কাঁঠাল-ডালে ঝোলানো দোলনাটিতে শুইয়ে দিত তখন সে যেন স্বর্গসুখ উপভোগ করত।

আদালতের আদেশ অনুসারে কাঁঠালগাছটি যখন কাটা পড়ল তখন বিনা দোষে স্বর্গচ্যুত হ'তে হল তাকে।

তৃতীয় ট্র্যাজেডি হ'ল এক শালিক দম্পতির। ওই কাঁঠালগাছে নীড় বেঁধে ডিম পেড়েছিল তারা।

আদর্শ ও বাস্তব

ডাক্তার প্রিয়গোবিন্দ বসাক ছাত্র জীবনে আদর্শবাদী ছিলেন। যে সকল আদর্শ মনুষ্যত্বকে চিরকাল উদ্বুদ্ধ করিয়াছে, সে সকল আদর্শ প্রিয়গোবিন্দকেও উদ্বুদ্ধ করিত। তিনি সত্যবাদী, পরোপকারী ও পরার্থপর ছিলেন। ছাত্রজীবনেই দেশপ্রেমে তাঁহার চিত্ত আলোকিত হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ, অশ্বিনীদত্তের ভক্তিযোগ, রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ-বিষয়ক রচনাবলী তাঁহার চরিত্রে যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহাই উত্তরকালে তাঁহাকে বিবিধ সৎকার্যে প্রণোদিত করে। আমাদের দেশে সৎকার্য করিবার সুযোগ অনন্ত। বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, অগ্নিকাণ্ড, ঝঞ্ঝা লাগিয়াই আছে বিপন্ন দেশবাসীর সেবা করা ছাত্রজীবনে প্রিয়গোবিন্দের প্রধান আনন্দ ছিল। সেই সময়ই প্রিয়গোবিন্দ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন যে, দেশ মানে দেশের মাটি নয়, দেশের মানুষ এবং আমাদের দেশের হিমালয় বা গঙ্গা পৃথিবীর মধ্যে যত শ্রেষ্ঠত্বই লাভ করুক না কেন, এদেশের অধিকাংশ মানুষই অত্যন্ত নিম্নস্তরের। অন্নহীন, বস্ত্রহীন, স্বাস্থ্যহীন ও নিরক্ষর পশুর দল। এই পশুদেরই সেবা করিয়া মানুষ করিয়া তুলিতে হইবে,—ইহাই প্রিয়গোবিন্দ বসাকের স্বপ্ন ছিল একদিন। এই স্বপ্নই তাঁহার ছাত্রজীবনের সমস্ত কর্মকে নিয়ন্ত্রিত করিত। ইহারই প্রেরণায় তিনি ক্ষুদিরামের চিতার ভস্ম সংগ্রহ করিয়াছিলেন, বিপ্লবী-দলের আদর্শে ছোট একটি দল গঠন করিয়াছিলেন, ছোট একটি নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন, আরও কত কি করিয়াছিলেন।

এই স্বপ্নের ঘোরেই প্রিয়গোবিন্দ ডাক্তারি পাশ করিয়া ফেলিলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বিবাহও হইয়া গেল এবং তাহার কিছুদিন পরেই বাবা মারা গেলেন। যে অন্নহীন, বস্ত্রহীন, স্বাস্থ্যহীন ও নিরক্ষর পশুর দলকে তিনি এতদিন দূর স্বপ্নলোকে প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন, তাহারই একটা অংশ সহসা

বাস্তবলোকে মূর্ত হইয়া তাঁহাকে যেন ঘিরিয়া ধরিল। তিনটি ছোট ভাই, দুইটি অবিবাহিতা ভগ্নী, দুইটি বিধবা পিসি বিধবা মা এবং তরুণী ভার্যা তাহাদের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা, ক্ষুধা ও পিপাসার দাবী লইয়া তাঁহার মুখের দিকে সোৎসুকে চাহিয়া রহিল।

চাকুরির জন্য প্রিয়গোবিন্দ নানাস্থানে ত্রিশটি দরখাস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু কোথাও চাকুরি জুটিল না। তাঁহার বিরুদ্ধে পুলিশ-রিপোর্ট এমনই কড়া ছিল যে, কোনও কর্তৃপক্ষই তাঁহাকে নিয়োগ করা নিরাপদ মনে করিলেন না।

ইহার ঠিক পনর বৎসর পরে প্রিয়গোবিন্দ সহসা একদিন সচেতন হইলেন। মনে হইল, কোন এক অদৃশ্য হস্ত যেন ঠাস কবিয়া তাঁহার গালে চড় মারিয়া গেল।...দামী মোটবকার নিঃশব্দ দ্রুতগতিতে চলিযাছে। কিন্তু সেই নৈঃশব্দ্যেব মধ্যেও প্রিয়গোবিন্দ যেন চাপা হাসির আওয়াজ শুনিতেছিলেন। বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথ, অশ্বিনী দত্ত, গান্ধীজী, কানাইলাল, বাঘা যতীন এবং আরও অনেকে যেন চুপি চুপি হাসিতেছেন। প্রিয়গোবিন্দর মনে হইল, তাঁহারা অনেকদিন হইতেই হাসিতেছিলেন, আজ তিনি সহসা সেটা শুনিতে পাইয়াছেন। অদৃশ্য হস্ত তাঁহার গালে আর একটা চড় মাবিল। শতচ্ছিন্ন, ময়লা কাপড়-পরা অবালবৃদ্ধা মেযেটাব অশ্রুসিক্ত মুখখানা চোখেব সামনে ভাসিযা উঠিল একবাব। তাহাব মিনতিপূর্ণ কথাগুলিও আবাব তিনি শুনিতে পাইলেন :

"আমি বড গরীব বাবু, আপনার ফী দেবাব সামর্থ্য আমার নেই --"

"ওষুধের দাম দিতে পারবে তো ?"

"কত লাগবে বাবু ?"

"ইনজেকশন দিতে হবে। টাকা পাচেক করে লাগবে প্রতি ইনজেকশনে—"

"আমি বড় গরীব বাবু—"

ঠিক এই সময়েই যজ্ঞেশ্বরবাবুর মোটরখানা তাঁহার ডিসপেন্সারির সম্মুখে দাঁড়াইয়া সিংহনাদ করিয়াছিল। যজ্ঞেশ্বরবাবুর মোটরের হর্নের শব্দ যেন তাঁহার অহঙ্কারেরই বাঙ্ময় রূপ। প্রিয়গোবিন্দ আর কালবিলম্ব না করিয়া উঠিয়া পড়িয়াছিলেন। শতচ্ছিন্ন, ময়লা কাপড়-পরা মেয়েটার কথা সম্পূর্ণরূপে

শুনিবারও ধৈর্য তাঁহার আর থাকে নাই। যজ্ঞেশ্বরবাবুকে গিয়া ইনজেকশন দিলেই ষোল টাকা ফী এবং যজ্ঞেশ্বরবাবু যদি তাঁহার উপর সন্তুষ্ট হন, তাহা হইলে আরও বহু ষোল টাকা…না, নিত্য অভাবগ্রস্ত প্রিয়গোবিন্দ ধৈর্যরক্ষা করিতে পারেন নাই।

মোটর নিঃশব্দ দ্রুতবেগে চলিতে ছিল। প্রিয়গোবিন্দ ফিস ফিস হাসি শুনিতে শুনিতে চলিয়াছিলেন। তাঁহার মনে হইল সেই চাপা হাসি ক্রমশঃ যেন ভাষায় রূপান্তরিত হইতেছে। তিনি শুনিতে পাইলেন: "তুমি যাহাকে ইন্‌জেকশন দিবার জন্য উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া চলিয়াছ, সে লোকটি দুরাচার চরিত্রহীন,' পাষণ্ড কালোবাজারী। তাহার সিফিলিস হইয়াছে। ইহা তোমার অবিদিত নাই যে, ব্যাধিটি তাহার স্বোপার্জিত এবং অকথ্য চরিত্রহীনতার পরিচায়ক। লোকটির টাকা আছে, তাই তুমি লালায়িত হইয়া পুলকিত কলেবরে তাহার চিকিৎসা করিতে ছুটিয়া চলিয়াছে। আর যে দীনদরিদ্র অভাগিনীকে তুমি তুচ্ছ করিয়া চলিয়া আসিলে, যাহার কথা শেষ পর্যন্ত শুনিবার ধৈর্য পর্যন্ত তোমার রহিল না, তাহার যক্ষ্মা হইয়াছে। সে বেচারী গরীব, তাই তাহার চিকিৎসা করিতে তুমি উৎসাহ পাইলে না! একটা কথা কি তুমি ভাবিয়া দেখিয়াছ প্রিয়গোবিন্দ? যজ্ঞেশ্বরের সিফিলিস এবং ওই মেয়েটির যক্ষ্মা কি একই অবস্থার দুই দিক নয়! যে সামাজিক এবং রাজনৈতিক অব্যবস্থার ফলে যজ্ঞেশ্বর অত্যধিক টাকা রোজগার করিয়া মাথা ঠিক রাখিতে পাবে নাই, সেই সামাজিক ও রাজনৈতিক অব্যবস্থাই ওই অভাগিনী মেয়েটিকে অন্নহীন, বস্ত্রহীন, যক্ষ্মাগ্রস্ত করিয়াছে। চতুর যজ্ঞেশ্বর আইনের সদ্ব্যবহার বা অপব্যবহার করিয়া টাকা লুণ্ঠন করিতে পারিয়াছে বলিয়াই ওই মেয়েটির ভাগে কিছুই থাকে নাই। আদর্শবাদী প্রিয়গোবিন্দ, ভাবিয়া দেখ, কাহাকে চিকিৎসা করা তোমার উচিত ছিল?…"

মোটর সিংহগর্জন করিতে করিতে ছুটিতেছিল। প্রিয়গোবিন্দ নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিলেন।

৩

আরও পঁচিশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। প্রিয়গোবিন্দের তিনটি পুত্র হইয়াছে। সংসারের চাপ আর ততটা বেশী নাই। প্রিয়গোবিন্দ ঠিক করিলেন, এইবার তিনি তাঁহার আদর্শ অনুসরণ করিয়া চলিবেন। দেশে দরিদ্র রোগীর অভাব নাই। এইবার তাহাদের সেবা করিতে হইবে। বিশেষত সদ্যআগত বিলাতী ডিগ্রীধারী ডি পি গোহা নামক যে ডাক্তারটি বিজ্ঞাপন, দালাল ও ভাঁওতার জোরে বহু রোগীকে ধনে প্রাণে নাশ করিতেছে, তাহার কবল হইতে যতগুলিকে পাবেন, তিনি রক্ষা করিবেন। চিকিৎসা করা মানে যে রোগীকে বিবিধ প্রকার খরচের ঘূর্ণাবর্তে ফেলিয়া সর্বস্বান্ত করা নয়, তাহা হাতে কলমে তিনি দেখাইয়া দিবেন। নিজের যদি লাভের লোভ না থাকে, তাহা হইলে স্বল্প ব্যয়ে সুচিকিৎসা করা যে সম্ভবপর, তাহা প্রমাণ করিবার সুযোগ ভগবান এতদিন পরে যখন তাঁহাকে দিয়াছেন, তখন সে সুযোগ তিনি পরিত্যাগ করিবেন না।

এই মনোভাব লইয়া প্রিয়গোবিন্দ প্রথম যেদিন নিজের ডিস্‌পেন্সারিতে গেলেন, সেইদিনই একটি মনোমত রোগী জুটিয়া গেল। লোকটি বহুকাল পূর্বে তাঁহারই ভৃত্য ছিল। চুরি করিয়াছিল বলিয়া তাহাকে তিনি তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। রামরতন সাশ্রুনেত্রে তাহার জীবনকাহিনী বর্ণনা করিয়া গেল। অনেক ঘাটের জল খাইয়াছে সে। উড়িষ্যা, আসাম, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব— কোথাও বাকী নাই। একবার না কি তাহার জেলও হইয়াছিল।

সমস্ত বর্ণনা করিয়া রামরতন অবশেষে প্রিয়গোবিন্দের পা দুটি জড়াইয়া ধরিয়া বলিল: "আমার দেশে মাত্র দু বিঘে জমি আছে বাবু, আর আমার কিছু নেই। পেটে অন্ন নেই, পরণে বস্ত্র নেই। খেটে খাবারও সামর্থ্য নেই আমার আর। যে কালরোগে ধরেছে বাবু, একটু কিছু করতে গেলেই হাঁপিয়ে পড়ি। রিকশ' টানার কাজ নিয়েছিলাম একটা, কিন্তু পারলাম না, মুখ দিয়ে রক্ত উঠতে

লাগল। ঝলকে ঝলকে রক্ত। তাছাড়া জ্বর সর্বদা লেগেই আছে। অনেক জায়গায় ওষুধ খেয়েছি ডাক্তারবাবু, কোথাও কিছু হয়নি। শেষকালে ভাবলাম, পুরোনো মনিবের কাছেই যাই, তিনি রাখতে চান রাখবেন, মারতে চান মারবেন—"

পা জড়াইয়া রামরতন হু হু করিয়া কাঁদিতে লাগিল। প্রিয়গোবিন্দ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, এ অবস্থায় আমাদের দেশের শতকরা আশীজনের যাহা হয়, রামরতনের তাহাই হইয়াছে। সে যক্ষ্মাগ্রস্ত তাহার দুইটি ফুসফুসই আক্রান্ত।

প্রিয়গোবিন্দ বলিলেন: "বেশ। তোর চিকিৎসা আমি করব। অসুখটি অবশ্য সাংঘাতিক হয়েছে—"

"এ অসুখের কি একটা ইনজেকশন বেরিয়েছে না কি বাবু?"

প্রিয়গোবিন্দ বুঝিলেন, রামরতন স্ট্রেপ্‌টোমাইসিনের কথা শুনিয়াছে।

বলিলেন: "বেরিয়েছে বটে, কিন্তু তাতে অনেক খরচ, তুই পেরে উঠবি না। আর সে ইনজেকশন নিলে যে সারবেই এমনও কোন কথা নেই—"

"কত খরচ—"

"আড়াই শ'—তিন শ' টাকা ওষুধেরই দাম লেগে যাবে।"

"আমার যে জমিটা আছে, সেটা বিক্রী করে' দিলে শ' তিনেক টাকা আমি পেতে পারি।"

"না, না, সে দরকার নেই। কম খরচে তোর সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি, দেখ্‌ না। ভাল খেতে হবে, সেইটেই হল প্রথম কথা। দুধ, ডিম, মাংস,—এই সব খাওয়া চাই। তারপর আসল কথা হল বিশ্রাম। তুই ওবেলা আসিস, সব ব্যবস্থা করে' দেব।"

"ইনজেকশন দেবেন না?"

"এখন ইনজেকশন দরকার নেই।"

রামরতন চুপ করিয়া রহিল।

"তুই ওবেলা আসিস, তোর কখন কি খেতে হবে, আমি একটা কাগজে

কর্জ করে দেব, আর হজমের ওষুধও দেব একটা, তার দামও দিতে হবে না তোকে, বুঝলি—”

“আচ্ছা—”

রামরতন চলিয়া গেল, কিন্তু আর ফিরিল না।

কয়েকদিন পরে প্রিয়গোবিন্দ খবর পাইলেন যে, সে নিজের দুই বিঘা জমি বিক্রয় করিয়া দিয়াছে এবং ডাক্তার ডি পি গোহার নিকট গিয়া ইনজেকশন লইতেছে।

প্রিয়গোবিন্দ নির্বাক হইয়া রহিলেন।

ইহার কয়েকদিন পরে প্রিয়গোবিন্দ নিজেই সন্ন্যাসরোগে আক্রান্ত হইলেন। যে স্টেথোস্কোপটি বহু লোকের বুকে বসাইয়া তিনি সারাজীবন অর্থোপার্জন করিয়াছেন, সেইটি তাঁহার চোখের সামনে দেওয়ালে ঝুলিতেছিল। সেইটির দিকেই তিনি নির্নিমেষে চাহিয়াছিলেন। ক্রমশ তাঁহার চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হইয়া আসিল। মনে হইল, স্টেথোস্কোপটিও রূপপরিবর্তন করিয়াছে। তাহা আর স্টেথোস্কোপ বলিয়া মনে হইতেছে না, মনে হইতেছে যেন একটি জিজ্ঞাসা-চিহ্ন শূন্যে ঝুলিয়া রহিয়াছে।

দুইদিন পরে তাঁহার মৃত্যু হইল।

——

অলক্ষ্যে

১

ঘটনাটা ঘটেছিল ঠিকই, কিন্তু কি করে ঘটেছিল তা জানি না। এইটুকু শুধু জানি, বৈজ্ঞানিকেরা এ রহস্যের হদিস পাবেন না, রসিকেরা হয়তো পেলেও পেতে পারেন।

পলাশ গাছের তলায় এক বুড়ি কাঠ কুড়িয়ে বেড়াচ্ছিল একদিন। সঙ্গে ছিল তার কিশোরী নাতনী সুখীয়া। সুখেরই জীবন্ত প্রতিমূর্তি যেন সে। সে কাঠ কুড়োচ্ছিল না। মনের আনন্দে চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছিল শুধু। কখনও কুলগাছের ডালে নাড়া দিয়ে, কখনও নামহীন বন্যলতার ফুল পেড়ে, কখনও এক ঝাঁক উড়ন্ত প্রজাপতির দিকে চেয়ে চেয়ে সময় কেটে যাচ্ছিল তার। খানিকক্ষণ পরে হঠাৎ সে এসে পলাশ গাছটার তলায় উর্ধ্বমুখে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। অনেক উঁচুতে ফুল ফুটে আছে। গাছে না উঠলে পাড়া যাবে না। নাগালের মধ্যে যেগুলো রয়েছে সেগুলো কুঁড়ি। গাছেই উঠতে যাচ্ছিল সে কিন্তু বুড়ি মানা করলে।

"কি করছিস"

"ওই ফুলগুলো পাড়ি"

"না, গাছে উঠতে হবে না। পনর দিন পরে বিয়ে, মেয়ে গাছে উঠতে যাচ্ছেন।"

"উঠলেই বা।"

"পড়ে' গিয়ে হাত পা যদি ভাঙে তাহলে তিকুর সঙ্গে আর বিয়ে হবে না তোমার। মুংলির বাপ মা ওৎ পেতে আছে।"

বলিষ্ঠ গঠন ভিকুর চেহারাটা ফুটে উঠল স্থধীয়ার মানস-পটে। গাছে ওঠবার চেষ্টা সে আর করলে না।

"তুমি আবার কবে এদিকে আসবে দিদিমা।"

"দিন সাতেক পরে।"

"আমি তখন কিন্তু আসব তোমার সঙ্গে।"

"আসতেই হবে, অত বড় বোঝা আমি বইতে পারব না।"

"আমার বিয়ে হয়ে গেলে তোমার বোঝা বইবে কে।"

"তুমি আর ভিকু দু'জনে।"

হেসে উঠল স্থধীয়া।

সমস্ত কথাগুলি মন দিয়ে শুনলে তারা।

২

দখিন হাওয়া এসে খোসামোদ করে গেল অনেক। আমোলই দিলে না তারা। তারপর এল একদল ভ্রমর।

"ঘোমটা খুলবে না নাকি তোমরা।"

তারা নিরুত্তর। অনেকক্ষণ ধরে' গুঞ্জন করলে ভোমরারা। কিচ্ছু ফল হলো না। এক ঝলক রোদ এসে পড়ল তাদের মুখে। সূর্যকিরণের আতপ্ত আহ্বানে আকুল হয়ে উঠল তাদের অন্তর, কিন্তু তবু তারা টলল না। মুখ টিপে চুপ করে' বসে রইল জেদ করে' যেন। প্রতিবেশীরা বলতে লাগল, "তোদের মতলব কি বল দিকি। বসন্ত যে বয়ে গেল—"

সাড়াই দিলে না তারা।

একবার নয়, বারবার চেষ্টা করলে সবাই! আবার এল দখিন হাওয়া, আবার এল ভ্রমরের দল, আবার এল সূর্যকিরণের আহ্বান, প্রতিবেশীদের মিনতি। দেহের শিরায় উপশিরায় সঞ্চারিত হল রসাবেগ। অবরুদ্ধ সৌরভ মথিত করে' তুলতে লাগল উন্মুখ চেতনাকে।

কিন্তু তবু তারা মুখ টিপে বসে রইল চুপ করে'।

নবমঞ্জরী

সাতদিন পরে।

সুখীয়া ভিকুর দিকে চেয়ে বললে, "দিদিমা আসে নি ভালই হয়েছে, না?"

"দিদিমা এলে কি আমি আসতে পারতাম।"

"দিদিমার জন্যে কিন্তু বড় এক বোঝা কাঠ নিয়ে যেতে হবে—"

"ওই গাছটায় উঠে কিছু কাঠ ভাঙি তাহলে।"

"সাবধানে উঠো।"

ভিকু চলে গেল।

সুখীয়া পলাশ গাছটার দিকে চেয়ে দেখলে একবার।

"ওমা, এ কুঁড়িগুলো ফোটেনি এখনও।"

তবু কি মনে করে' সেইগুলোকেই তুলে খোঁপায় সে পরে নিল।

সুখীয়া কাঠেব বোঝা মাথায নিয়ে চলেছিল। তাব পিছু পিছু ভিকু চলেছিল বাঁশী বাজাতে বাজাতে। হঠাৎ ভিকু বলে' উঠল—"তোমার খোঁপায় একটা আশ্চর্য কাণ্ড হচ্ছে কিন্তু।"

"কি।"

"পলাশফুলেব কুঁড়িগুলো ফুটে উঠেছে!"

"তোমার বাঁশীর সুব শুনে বোধ হয়।"

মুচকি হেসে ভিকু ফুঁ দিল আবার বাঁশীতে। ফুল ফোটার আসল কারণটা কিন্তু কেউ জানল না।

অদ্ভুত বার্তা

আপনারা কেহ শুনিয়াছেন কি না জানি না, কিন্তু কল্পনাবেতার-যোগে আমি একটি অদ্ভুত বার্তা শ্রবণ করিয়াছি। বার্তাটি এই :

দেবী বীণাপাণি সম্প্রতি নিয়ম করিয়াছেন যে, তিনিও ভোট লইয়া ঠিক করিবেন, কোন্ পাঁচটি অক্ষর বা যুক্তাক্ষর কাব্য-রচনায় প্রাধান্য লাভ করিবে। যাহারা ভোটে জয় লাভ কবিবে, কবিদের চেতনায় তাহাদেরই রূপ এবং ধ্বনি বারংবার প্রতিফলিত করিয়া দেবী কবিগণকে প্ররোচিত করিবেন, যাহাতে উক্ত অক্ষর বা যুক্তাক্ষরগুলি তাঁহাব নিজ নিজ কাব্যে পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করেন।

পঞ্চাননকে তুষ্ট করিবার জন্যই নাকি পাঁচের প্রতি দেবীর এই পক্ষপাত। অধিকাংশ অক্ষরই রুষ্ট হইয়া ভোট-যুদ্ধে যোগদান কবেন নাই। মাত্র আটজন এই দ্বন্দ্বে নামিয়াছিলেন। ভোটদাতা দেবগণের নিকট প্রত্যেকে স্বকীয় যোগ্যতার প্রমাণ-স্বরূপ যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাও উক্ত কল্পনা বেতার যোগে আমি শ্রবণ করিয়াছি।

প্রার্থী 'ন্দ' বলিতেছিলেন : "হে দেবগণ, আমি মকরন্দে আছি, চন্দ্রে আছি, ইন্দ্রে আছি, ছন্দে আছি! মন্দের মধ্যেও আমাকে থাকিতে হইয়াছে, কারণ, আমি জানি, মন্দের মধ্যেও ভাল আছে। দ্বন্দ্ব মানে যাঁহারা কেবলমাত্র কলহ বোঝেন, আমি তাঁহাদের দলে নই। যে দ্বন্দ্ব অর্থে যুগল-মিলন, আমি সেই দ্বন্দ্বের নির্মাতা। একজন ভোটপ্রার্থী 'খন্দ' নামক প্রাকৃত কথার উল্লেখ করিয়া আমাকে এবং প্রিয়বন্ধু 'খ'কে ব্যঙ্গ করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছেন। আমি 'খন্দ' রূপে যে প্রতি পথিককে সাবধানতা শিক্ষা দিতেছি, তাহা উক্ত সমালোচক মহাশয়ের মাথায় আসে নাই। এ বিষয়ে আমি তর্ক করিতে চাই না। আমি শুধু আপনাদের স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, নন্দনে, চন্দনে, আনন্দে,

বন্দনায় আমি চিরকাল আপনাদেরই সেবা করিয়া আসিয়াছি। আপনারা যদি আমাকে নির্বাচন নাও করেন, তাহা হইলেও করিব। বিশাল শব্দ-সাম্রাজ্যের বহু স্থানে কুন্দেন্দুবরণ্য বাগ্‌দেবী আমাকে বহুভাবে নিয়োজিত করিয়া ধন্য করিয়াছেন। তাঁহারই প্রসাদ-মানসে আমি আজ এই দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হইয়া আপনাদের সুবিচার প্রার্থনা করিতেছি। ইহার বেশী আমার আর কিছুই বলিবার নাই।"

অঃ, অঃ, অঃ, অঃ—বিসর্গের দল হাসিয়া উঠিল।

তাহার পর সুরু করিলেন প্রার্থী 'গ': "হে অমরবৃন্দ, বহুস্থানেই আমার সাক্ষাৎ আপনারা নিশ্চয়ই পাইয়াছেন। আমার বহুবিস্তৃত আভিধানিক রূপ বিস্ফারিত করিয়া আপনাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাইতে চাই না। শুধু বলিতে চাই, আমি গণেশে আছি, গগনে আছি, গতিতে আছি, গহনে আছি, গঙ্গে আছি—"

কে একজন বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল: "তুমি গর্দভে আছ, গোঁজামিলে আছ, গাঁটকাটায় আছ, গাঁজাতে আছ, গাফিলতিতে আছ, গাড্ডায় আছ,—তোমার কীর্তি অনেক।"

প্রার্থী 'গ' থতমত খাইয়া থামিয়া গেলেন মনে হইল। কিন্তু পরমুহূর্তেই তিনি পুনরায় আরম্ভ করিলেন: "গল্পে, গীতে গঙ্গায়, গোবিন্দে, সাগরে, গিরিতে, গুরুতে, গরিষ্ঠে, গুণপনায় গৌরবে আমার পরিচয় যাঁহারা পান না—"

বিরুদ্ধবাদী সেই লোকটি বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল: "তোমার আসল পরিচয় পাই গোক্ষুরে, গলগণ্ডে, গলগ্রহে—"

প্রার্থী 'গ' চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন: "গরুড়, ভগবান, ভগবতী গান্ধারী, গন্ধর্বতে কি আমি নাই?"

"গাধা, গোবর এবং গয়াতেও আছ—"

"মহাত্মা গান্ধী গার্গী, গ্যালিলিও'র কীর্তির সহিত কি আমি জড়িত নই?"

"ছাগল, পাগল এবং বগলের সহিতও তুমি জড়িত—"

তুমুল কোলাহল হইতে লাগিল। তাহার পর সব থামিয়া গেল হঠাৎ।

কিছুক্ষণ নীরবতার পর শোনা গেল, ক্ষীণকণ্ঠে কে যেন বলিতেছেন: "হে অন্তর্যামিগণ আপনারা তো সব জানেন। আপনাদের নিকট বাগ্‌বিস্তার করা ধৃষ্টতা মাত্র। একটি কথা শুধু আপনাদের মনে রাখিতে অনুরোধ করিতেছি, আমি 'ধ' নই, আমি 'ধী'। যতদিন 'ধ' ছিলাম, ততদিন আমাকে 'ধর ধর' 'ধড়ফড়' 'ধক ধক' 'ধড়িবাজ' 'ধকল' ইত্যাদি অভব্য কথাগুলি সৃষ্টি করিতে হইয়াছে। ধরার উর্ধ্বে উঠিতে পারি নাই। 'উ' ও 'ঊ'— ইহাদের সহিত যুক্ত হইয়াও শান্তি পাইলাম না। ধূর্ত, ধূসর, ধূম, ধূলি ধুয়াতেই নিবদ্ধ থাকিয়া আমাব উচ্চাকাঙ্ক্ষা বেদনায় ধুক ধুক করিতে লাগিল। এখন আমি 'ঈ'কে বরণ করিয়া 'ধী' হইয়াছি। শান্তি পাইয়াছি। ধন্য হইয়াছি। হে সুধীবর্গ, এই কথাটিই শুধু আপনাদিগকে স্মরণ রাখিতে অনুরোধ করিতেছি যে, আমি 'ধ' নয় 'ধী,—"

বিপক্ষ দলের একজন বলিল: "সাধু, সাধু! আপনি যে বহুবার বিভিন্ন বিভিন্ন স্বরবর্ণের সহিত বন্ধুত্ব করিয়া অবশেষে তাহাদের ত্যাগ করিয়াছেন, এ সংবাদে আপনার প্রণয়-নিষ্ঠাব পরিচয় পাইলাম। যাঁহাকে স্বয়ং বীণাপাণি ধৈবতে স্থান দিযাছেন, ধামরে উদাত্ত করিয়াছেন, ধেনুরূপে শ্রীকৃষ্ণের কৃপা-লাভ করিয়া যিনি গোকুলে আজও অমর হইয়া আছেন, তাঁগাব 'ঈ'-প্রীতি সত্যই বিস্ময়কর। হে ধৃষ্ট ধুরন্ধর, তোমাকে ধিক!"

'ধী' ইহার কোন প্রতিবাদ করিলেন না।

চতুর্দিকে পুনরায় নীরবতা ঘনাইয়া আসিল।

তাহার পর শুনিলাম, কে একজন বলিয়া উঠিলেন: "চুপ চুপ। প্রার্থী 'জ' উঠিয়াছেন।"

প্রার্থী 'জ'য়ের কণ্ঠস্বর শোনা গেল: "আমার কোনও স্বরবর্ণের প্রতি পক্ষপাত নাই। আমি সকলের সহিত মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে ভালবাসি। তাই জগৎ জুড়িয়া আমি আছি। জন্মে, জীবনে জয়ে পরাজয়ে, জলদে জরদে, জনতায় জঙ্গলে, জপে, জঙ্গমে, জনকে, জননীতে, জনার্দনে—সর্বত্র

আছি। কাহারও প্রতি আমার পক্ষপাত নাই। জমদগ্নি, জাহাঙ্গীর, জরাসন্ধ, জয়চন্দ্র, জয়পাল, জয়ন্ত, জয়দেব, জটায়ু, জাহ্নবী, জুলিয়াস্-সিজার, জর্জ—”

প্রার্থী ‘জ’ হয়তো আরও কিছু বলিতেন, কিন্তু বিপক্ষ দল সে সুযোগ তাঁহাকে দিল না। একজন চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল : “বাকী তালিকাটা আমি সম্পূর্ণ করিয়া দিতেছি, আপনাকে আর কষ্ট করিতে হইবে না। আপনি জটিলায়, জটিলতায়, জঞ্জালে, জতুগৃহে, জড়তায়, জরায়, জারজে, জয়দ্রথে, জ্বালায়, জড়ুলে, জঘনে, জল-পড়ায়, জাঁকজমকে—কোথায় নাই? আপনি সর্বত্র গজগজ করিতেছেন, জাহান্নামকেও আপনি ত্যাগ করেন নাই! হে সুবিধাবাদী, আপনাকে নমস্কার।”

সুরবৃন্দের হাস্য-কলরবে সভা মুখরিত হইয়া উঠিল।

তাহার পর আর একজন প্রার্থী উঠিলেন। তিনি বলিলেন : “আমি ‘বৃ’। আমি ‘ব’ নই, ‘ঋ’-ও নই। উভয়েব সংযোগে আমি বৃ। আমার আকাঙ্ক্ষা বৃহৎ। বৃহস্পতি, বৃকোদর, বৃষভানু, বৃন্দাবন, বৃষাঙ্ক সৃষ্টি করিয়াই আমি চরিতার্থ। আমার আর কিছু বলিবার নাই।”

বিপক্ষ দলের একটি ছোকরা বলিল : “আপনার বৃহন্নলা-রূপটিও চমৎকার!”

সভায় বিশেষ গোলমাল হইল না।

তাহাব পর উঠিলেন প্রার্থী ‘র’ : “হে সুরকুল, আমি আপনাদেরই অঙ্গ—”

বিপক্ষ দল বলিযা উঠিল : “আপনি অসুরেবও অঙ্গ—”

“আমি রবিতে আছি, রাকায আছি—”

“রাহুতেও আছেন—”

“আমি রাগ-রাগিণীতে—”

“রাসভই তাহার প্রমাণ—”

“রাম শব্দ নির্মাণ করিয়া আমি ধন্য—”

“রাবণ নির্মাণ করিয়াও তো আপনি ধন্য—”

“এমনভাবে বাধা দেওয়াটা কি ভদ্রতা-সঙ্গত?”

“ভোট চাহিতে আসিয়াছেন, ন্যায্য সমালোচনা শুনিতে হইবে বৈকি—”

"আমি আর কিছু বলিব না, আপনারা যাহা খুশী করুন।"

প্রার্থী 'র' ক্রোধভরে বসিয়া পড়িলেন।

সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থী 'ব' শুরু করিয়া দিলেন: "আমার বক্তব্য সংক্ষিপ্ত। হে দেবতাগণ, আমার স্বরূপ আপনাদের অবিদিত নাই। অর্বাচীন-মহলে আত্মপ্রশংসা করিয়া আমি নিজেকে অবনমিত করিতে চাই না—"

প্রার্থী 'ব' বসিয়া পড়িলেন।

সভায় তুমুল কোলাহল, হাস্যকলরব, তর্কবিতর্ক চলিতে লাগিল। তাহার পর সমস্ত নীরব হইয়া গেল।

কল্পনা-বেতার-যোগে কিছুক্ষণ পরে ঘোষিত হইল: "জ র দ গ ব নির্বাচিত হন নাই। শুধু তাই নয়, ইঁহাদের কেহই একটি ভোটও পান নাই।"

কল্পনা-বেতার কিছুক্ষণ পরে আর একটি সংবাদ ঘোষণা করিল: "বলরামের অনুরোধে 'ব' এবং রতি দেবীর অনুরোধে 'র' বীণাপাণির নমিনেশন পাইয়াছেন। সুতরাং ধী ব র বৃ ন্দ অবশেষে নির্বাচিত হইলেন।"

—

কপাল

মাছ মাংসের স্বাদ প্রায় ভুলে গেছি। কিনে খাবার সামর্থ্য নেই। হঠাৎ নজরে পড়ল পাশের বাড়ির আঁস্তাকুড়ে অনেক পাখীর পালক পড়ে' রয়েছে। মনে হল দাস মশায় মুর্গি খাচ্ছেন না কি? মুর্গির যা দাম আজকাল আমার তো দর করতে পর্যন্ত সাহস হয় না। দাস মশাশয়ও তো আমারই মতন ছাঁপোষা গৃহস্থ, হঠাৎ মুর্গি খাবার শখ হল কেন? এদিকে তো দেনায় ডুবে আছেন শুনতে পাই। জামাই এসেছিল না কি? প্রলুব্ধ নয়নে পালকগুলির দিকে চেয়ে সম্ভব-অসম্ভব নানারকম গবেষণায় ব্যাপৃত ছিলাম এমন সময় দাস মশায় স্বয়ং বেরিয়ে এলেন।

"কি দাস মশায়, একা একাই মুর্গি খাচ্ছেন না কি?"

"মুর্গি! মন্তর নেওয়ার পর থেকে আমি তো আর মুর্গি খাই না।"

"ওগুলো কি তাহলে—"

পালকগুলো দেখালাম।

"ওগুলো পায়রার পালক—"

"পায়রার দাম আজকাল কত করে'?"

"আমি তো কিনে খাই নি।"

"তবে—"

"আমার ওই খোলার ঘরটার পরলে এক জোড়া গোলা পায়রা এসে বাসা বেঁধেছিল। কোথা থেকে এসেছিল কে জানে! কিছু দিন পরে চিঁ চিঁ শব্দ শুনে বুঝলাম বাচ্ছা পেড়েছে। মনে হল ওদের যদি বংশ বৃদ্ধি হতে থাকে তাহলে তো টেকা যাবে না। গিন্নির ছুঁচি বাই, একটি ঠিকে ঝি মাত্র সম্বল। ভাবলাম সাবড়ে দেওয়াই বুদ্ধির কাজ। মাছমাংস কিনে খাবার তো আর সামর্থ্য নেই। রাত্রে আফিস থেকে ফিরে এসে চেয়ারের উপর টুল চড়িয়ে

ধরলাম পায়রাগুলোকে। একটা পালিয়ে গেল। তিনটেকে ধরতে পারলাম। চমৎকার লাগল অনেক দিন পরে। একটা পালিয়ে গেল বলে আফশোষ হতে লাগল খুব। কিন্তু দিন দুই পরেই আনন্দিত হলাম আবার। মাদি পায়রাটা পালিয়েছিল, বুঝলেন, দেখি সে আর একটি পুরুষ জুটিয়ে এনে ঠিক ওইখানটিতেই আবার ঘর বেঁধেছে। আবার কিছুদিন পরে বাচ্ছা হল, আবার সেই বাচ্ছা দুটিকে এবং পুরুষ পায়রাটিকে খেলাম আমরা। মাদিটাকে ইচ্ছে করেই ছেড়ে দিলাম। কয়েক দিন পরে দেখি আবার সে একটি সঙ্গী জুটিয়ে এনেছে। আবার তাদের বাচ্ছা হল, আবার খেলাম। এই ভাবেই চলছে।"

"আমিও এক জোড়া পুষব না কি।"

"পুষুন না। যা দিনকাল পড়েছে, চারিদিকে নানাভাবে টোপ না ফেললে বাঁচা যাবে না—"

কথাটা মনে লাগল। সেই দিনই নগদ পৌনে তিন টাকা খরচ করে' কিনে আনলাম এক জোড়া পায়রা। আরও টাকা চারেক খরচ করে' তাদের থাকবার টং তৈরি করলাম। যথাসময়ে বাচ্ছাও হল। দাস মশায়ের পদ্ধতি অনুসরণ করে যথারীতি সেগুলির সৎকারও করলাম।...

...পরের দিন টং খুলে দেখি মাদি পায়রাটা চুপ করে বসে আছে। তাড়া দিলাম, তবু সে খোপ থেকে বেরুল না। গিন্নি বললেন "ওকে বিরক্ত করছ কেন, খানিকক্ষণ পরে আপনিই বেরুবে।" পায়রাটা কিন্তু বেরুলই না। দু'দিন না খেয়ে চুপ করে' বসে' রইল। তৃতীয় দিনে মরে গেল। দাশ মশায়কে গিয়ে বললাম—"একি হল মশায়, পায়রাটা যে মরে গেল—"

"কি রকম।"

আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বললাম। শুনে হর্ষোৎফুল্ল হয়ে উঠলেন দাস মশাই। বললেন, "ও সতী পায়রা! খুব রেয়ার জিনিস। আপনি ভাগ্যবান লোক তাই আপনি পেয়েছিলেন, গঙ্গায় দিয়ে আসুন। চলুন দেখে আসি, দর্শনেও পুণ্য—"

দাসমশায় মরা পায়রাটাকে ভক্তিভরে প্রণাম করলেন। আমরাও করলাম। তারপর তাকে ফুল চন্দন দিয়ে নতুন কাপড় জড়িয়ে গঙ্গার ঘাটের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লাম। সতী পায়রার সৎকারের জন্যও প্রায় টাকা থানেক খরচ হয়ে গেল। সমস্ত পথটা নিজের ভাগ্যের কথা চিন্তা করতে করতেই গেলাম। আশ্চর্য্য কপাল!

——

ঘুঁটে

সেদিন বিশুদের সান্ধ্য আড্ডায় একটি গোল প্যাকেট হাতে করে' ভাদুড়ি মশাই ঢুকলেন।

"পাঁপর কিনলেন না কি ভাদুড়ি মশাই। বেশ জমিয়ে বড়দিন করবেন বলুন।"

সমস্বরে বলে' উঠল সবাই।

"না ভাই পাঁপর নয়।"

"তবে কি কেক।"

"কেক বলতে পার, কিন্তু তোমরা যে কেকের কথা ভাবছ তা নয়। এই দেখ।"

খবরের কাগজের মোড়ক খুলে ভাদুড়ি মশাই যা দেখালেন তা সত্যিই অপ্রত্যাশিত। ঘুঁটে একখানা।

"অমন যত্ন করে' কাগজে মুড়ে ঘুঁটে নিযে যাচ্ছেন মানে?"

"রাস্তায় পড়ে ছিল, কুড়িযে নিলাম। হাতে একখানা কাগজ ছিল, মুড়ে নিলাম তা দিযে। এতে দোষটা কি হযেছে। হয তো এর থেকেই আমাব ভাগ্য ফিরে যেতে পাবে, কিছু বলা যায কি।"

হো হো করে' হেসে উঠল সবাই।

"হাসছ হাস, হাসতে মানা নেই। কিন্তু এটা জেনে রেখ গোবর থেকে এই ঘুঁটে হয়েছে এবং মনে রেখ কংগ্রেসের বাক্সে গরুর ছবি আছে।"

"ঠিক বলেছেন ভাদুড়ি দা, ঘুঁটেকেই সম্বল করতে হবে এবার!'

নবীন অধ্যাপক তরুণ বিশ্বাস বললেন, "ভাদুড়ি মশাই ঘুঁটে খেয়ে এসেছেন না কি কিছু?"

ভাদুড়ি জবাব দিলেন না তার কথায়। স্মিতমুখে চুপ করে রইলেন।

তারপর আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে বললেন—"ভাগ্য যখন সুপ্রসন্ন হয় তখন কোথা দিয়ে কি করে' যে যোগাযোগ হয়ে যায় হিসেব করে' আগে থাকতে তা কেউ বলতে পারে না। মিষ্টার ভৌমিকের গল্পটা জান না তোমরা নিশ্চয়, জানবার কথাও নয়—"

বিশু বললে, "বলুন না শুনি—"

"শুনলে বিশ্বাস করবে না।"

"তবু বলুন।"

"আজ যিনি মিষ্টার ভৌমিক নামে সুপরিচিত, যাঁর কৃপাদৃষ্টি লাভ করবার জন্যে বহু বেকার লোক আজ উদ্‌গ্রীব, ক্রাইসলার গাড়ি ছাড়া যিনি চড়েন না, কোলকাতা শহরে আট দশখানা বাড়ির মালিক হ'য়ে, লোহালক্কড়ের কারবারে ফেঁপে উঠে, কোলিয়ারি জমিদারি মিল কিনে যিনি আজ বহুলোকের ঈর্ষা-মিশ্রিত শ্রদ্ধা সম্ভ্রম অর্জ্জন করেছেন তার আসল নাম কি জান? গজু। অনেকে গজাও বলত। উপাধি যে ভৌমিক এ খবর তো কেউ রাখতই না, গজু বা গজা যে কিসেব অপভ্রংশ এও জানত না অনেকে। আমি এখনও জানি না। গজেন্দ্র, গজানন, গজেশ বা গজপতি ওই রকম কিছু একটা হবে। সব কিন্তু চাপা পড়ে গিয়েছিল গজু বা গজার আড়ালে। মামার বাড়িতে মানুষ হয়েছিল গজু। মা, বাপ, ভাই বোন কেউ ছিল না তার। মামার বাড়িতে সে সকলের উপদেশ শুনত আর সকলের বকুনি খেত। এরই ফাঁকে ফাঁকে লেখাপড়াও সে করেছিল কিছুটা অবশ্য। আই, এ, না বি, এ, কি একটা পাশও যেন করেছিল মনে হচ্ছে। আর একটি বিশেষত্ব ছিল গজুর। গজু ডিটেকটিভ নভেলের ভক্ত ছিল খুব। কপাটটা বন্ধ করে' দাও তো হে, বেশ শীত পড়েছে আজ। চা টা খাওয়াবে না কি কেউ— ?"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়—"

ভাদুড়ি মশাই বিশুদের ক্লাবের অনারারি মেম্বার। চাঁদা দেন না, নিয়মিত আসেনও না। মাঝে মাঝে এসে আড্ডা জমিয়ে যান কেবল।

চা এসে পড়ল। ভাদুড়ি মশাই ছিন্ন লুইটি দিয়ে সর্ব্বাঙ্গ ঢেকে চায়ে চুমুক দিলেন। অধ্যাপক তরুণ বিশ্বাস প্রশ্ন করলেন আবার।

"মিষ্টার ভৌমিক? কোথাকাব মিষ্টার ভৌমিক? কখনও নাম শুনেছি বলে' মনে হচ্ছে না তো?"

ভাদুড়ি মশাই হাসিভরা চোখে চেযে রইলেন তার দিকে খানিকক্ষণ। তাঁর মনে যে উষ্মা জেগেছে তা বোঝা গেল তাঁর কথা থেকে।

"তুমি দুনিয়ার ক'টা লোকেরই বা নাম শুনেছ? মিষ্টার ভৌমিকের নাম তোমার তো শোনবার কথাও নয়। একটা ওঁছা কলেজে প্রফেসারি কর তুমি, তিনজনের সঙ্গে শেয়াব কবে' বাস কব গলির গলি তস্য গলিতে একটা ঘুপচি ফ্ল্যাটে। তুমি মিষ্টাব ভৌমিকেব নাম শুনবে কি করে'? যা বলছি শুনে যাও, ফ্যাচাং তুলো না—"

চা'টি শেয কবে ভাদুড়ি মশাই জামার হাতা দিয়েই মুখটি মুছে ফেললেন। তারপর শুরু কবলেন।

"এ হেন গজুব যে কোনকালে কিছু হবে এ আশা কেউ করে নি। আমি কিন্তু একটা জিনিষ মার্ক• কবেছিলুম ছোকবা ডিটেকটিভ নভেলগুলো বেশ মন দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিযে পড়ে। তাব সঙ্গে আলোচনা কবে,' প্রত্যেক বারই মুগ্ধ হয়ে যেতাম। মনে হ'ত—বাঃ ছোকরা ঠিক পযেণ্টগুলি ধবেছে তো—। ওই ডিটেকটিভ নভেলই ওব উন্নতিব কাবণ হল শেষকালে—"

পকেট থেকে একটি অর্দ্ধ-দগ্ধ বিড়ি বাব কবে ধরালেন সেটি ভাদুড়ি মশাই।

"ডিটেকটিভ নভেল'উন্নতিব কাবণ হল? বলেন কি।"

"হ্যাঁ। একদিন সকালে রহমনপুবের জমিদাব বাড়ীব পাশ দিয়ে যেতে যেতে গজুর চোখে পড়ল মরা কাক পড়ে রয়েছে একটা। মরা কাক তো এমন কতই পড়ে থাকে, প্রথম দিন তেমন গ্রাহ্য কবে নি সে। কিন্তু উপর্য্যুপরি তিন চারদিন যখন সে জমিদার বাড়ির আশেপাশে মরা কাক দেখতে পেলে তখন তার মনে হল নিশ্চয়ই কোন ব্যাপার আছে এর মধ্যে। ডিটেকটিভ নভেল-পড়া

তীক্ষ্ণ মন নিয়ে সে ঘুরে বেড়াতে লাগল বাড়ির চারিদিকে। হঠাৎ নজরে পড়ল একটা কাক গাছের ডালে বসে' মরা ইঁদুর খাচ্ছে একটা। তাড়া দিতেই কাকটা উড়ে গেল, ইঁদুরটা পড়ে গেল তার মুখ থেকে। ইঁদুরটি তুলে নিলে গজু। এক ডাক্তারের সঙ্গে ভাব ছিল তার। ইঁদুরটি তাকে পরীক্ষা করতে দিল। ইঁদুরের ভেতর থেকে কি বেরুল জান? আর্সেনিক। খোঁজ খবর নিয়ে অনেক ব্যাপার বেরুল তার পর। জমিদারের এক চাকর জমিদারকে পয়জন করবার জন্যে সন্দেশের সঙ্গে আর্সেনিকের বিষ মিশিয়েছিল। কিন্তু একটি জরুরি কাজে জমিদারকে বাইরে চলে যেতে হয়েছিল বলে' সে সন্দেশ তাঁর আর খাওয়া হয়নি। চাকরটা সন্দেশগুলো ভাঁড়ার ঘরে লুকিয়ে রেখেছিল, ভেবেছিল জমিদার ফিরে এলে তাকে খাওয়াবে আবার। কিন্তু রাখে কেষ্ট মারে কে! জমিদার সাতদিন ফিরলেনই না। ইঁদুরেরা সেই সন্দেশ খেতে লাগল আর মরতে লাগল। মরা ইঁদুর খেলে কাকরা, তারাও ম'ল এবং তা পড়ল গজুর চোখে। কোথা থেকে কি হল দেখ।"

"তারপর।"

"সব শুনে জমিদার এত মুগ্ধ হয়ে গেলেন যে গজুর সঙ্গে তাঁর একমাত্র মেয়ের বিয়েই দিয়ে দিলেন শেষ পর্য্যন্ত। তাঁর বিশাল বিষয়ের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী ওই মেয়ে…"

"সত্যি?"

ভাদুড়ি মশাইয়ের যা স্বভাব হাসিভরা চোখে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন, "হ্যাঁ, সত্যি। গজু তারপর থেকে ক্রমশ উন্নতি করেছে। বিষয় অনেক বাড়িয়েছে। এখন সে মিষ্টার ভৌমিক। ফেমাস মিষ্টার ভৌমিক—"

"কোথায় থাকেন তিনি বলুন তো—"

অধ্যাপক তরুণ বিশ্বাস প্রশ্ন করলেন।

"কেন? তার সঙ্গে দেখা করবে যা-তে একটা হিল্লে হয়ে যায়? তার নাগাল পাওয়া অত সহজ নয় ভায়া। আচ্ছা উঠি—"

মুচকি হেসে বেরিয়ে গেলেন ভাদুড়ি। মিষ্টার ভৌমিক কোথায় থাকেন তা বলে গেলেন না, কারণ তা বলা সম্ভব ছিলনা তাঁর পক্ষে। গল্প বলবার সময় যদিও তিনি এমন ভাব দেখালেন যেন মিষ্টার ভৌমিক তাঁর বহুকালের বন্ধু, কিন্তু আসলে তিনিও ভৌমিককে চিনতেন না। আর গল্পটা শুনেছিলেন বন্ধু গণেশের কাছে। গণেশ শুনেছিল ট্রেনে এক যাত্রীর মুখে।

অন্ধকার গলি দিয়ে যেতে যেতে ভাদুড়ি ভাবতে লাগলেন—ঘুঁটে থেকে কি ক্লু পাওয়া যেতে পারে!

দুই রকম স্বাধীনতা

কিছুই ভাল লাগছিল না, তাই বাগানটায় গিয়ে বসলাম। অভাবগ্রস্ত হয়েছি তাই আর বাগানের সে শ্রী নেই। তবু গিয়ে বসলাম একটু। হঠাৎ চোখে পড়ল আমার লেডি হিলিংডনে ছোট একটি ফুল ফুটেছে। আশ্চর্য্য হলাম। মালিকে অনেক দিন আগেই বিদায় দিতে হয়েছে। গাছের একটুও যত্ন হয় নি, সার তো দূরের কথা—জল পর্য্যন্ত পড়ে নি। আগাছা গজিয়েছে চারদিকে, তবু ফুল ফুটেছে একটি। আরও আশ্চর্য্য হলাম-ফুলটি কথা কইল।

"নমস্কার, অনেকদিন পরে দেখা হল—"

নির্ব্বাক হয়ে চেয়ে রইলাম।

"আপনার শরীর খারাপ না কি? চেহারাটা বড় খারাপ দেখাচ্ছে।"

বিস্ময় কেটে গেল। মনের কথা বেরিয়ে পড়ল মুখ দিয়ে।

"চেহারা ভাল থাকবে কি করে' বল, খেতে পাই না।"

"কেন?"

"স্বাধীনতা পেয়েছি।"

লেডি হিলিংডন সবিস্ময়ে চেয়ে রইল আমার দিকে।

"আপনার কাপড় চোপড়ের অবস্থাও শোচনীয় দেখছি।"

"হ্যাঁ, তারও ওই কারণ—স্বাধীনতা।"

"স্বাধীনতা? কি আশ্চর্য্য। আমিও তো স্বাধীন, কিন্তু আমার তো এমন দুর্দ্দশা হয় নি। আপনার মালি যখন তদারক করত তখন একটু বেশি আরামে থাকতাম বটে, কিন্তু এখনও খুব যে খারাপ আছি তা নয়। দেখতেই তো পাচ্ছেন ফুল ফুটিয়েছি। হয়তো একটু ছোট কিন্তু তবু ফুল তো—"

চুপ করে রইলাম।

লেডি হিলিংডন আবার বললে—"সত্যি আপনাকে দেখে খুব কষ্ট হচ্ছে। এই দুর্দ্দশার প্রতিকারের জন্য কি করছেন?"

"মিটিং করছি, কাগজে লেখালেখি করছি—"আমার কথা লেডি হিলিংডন বোধ হয় বুঝতে পারলে না ঠিক। একটু চুপ করে থেকে আবার বললে—

"স্বাধীনতা আপনার কষ্টের কারণ কি করে হল ঠিক বুঝতে পারছি না। আমি তো স্বাধীন, আমার কোনও কষ্টই নেই।"

বললাম—"তুমি ফুল, আমি মানুষ। আমার স্বাধীনতা মানে—"

কেমন যেন গুলিয়ে ফেললাম। ইতিহাস, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব বিষয়ে যে সব বড় বড় বই পরীক্ষার জন্য মুখস্থ করেছিলাম তার একটি বর্ণ মনে পড়ল না। অপ্রতিভ দৃষ্টিতে তার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে শেষে বললাম —"আমার কষ্ট তুমি বুঝবে না। আমার যে কি অসহ্য কষ্ট—"

"আমি বুঝেছি।"

পাশের টব থেকে কথা কয়ে উঠল মৃতপ্রায় ক্রিসানথিমাম।

"লেডি হিলিংডন মাটিকে আশ্রয় করে' দাঁড়িয়ে আছে। তোমার মালি জল না দিলেও ওর শিকড় মাটির রস আহরণ করে' নিতে পারে। আমি আছি টবে, তোমার মালি জল না দিলে আমি বাঁচতে পারি না। আমার শিকড় টবের গায়ে আটকে যায় মাটি পর্য্যন্ত পৌঁছতে পারে না। তোমারও বন্ধু সেই অবস্থা। এক অদৃশ্য টবের উপর তুমি রয়েছ, বাইরে থেকে খাবার আসবে তবে তুমি বাঁচবে। তোমার কষ্ট আমি বুঝতে পারছি। আমরা উভয়েই সগোত্র। বাইরে থেকে রস এলে তবে আমরা ফুল ফোটাতে পারি। না এলে মরণ ছাড়া আমাদের আর গতি নেই। লেডি হিলিংডনের স্বাধীনতা আর তোমার আমার স্বাধীনতা এক নয়।"

চুপ করে বসে রইলাম খানিকক্ষণ। তারপর ক্রিসানথিমামের টবটা ভেঙে তাকে মাটিতেই পুঁতে দিলাম।

লেডি হিলিংডন হেসে বললে—"এবার আপনার টবটা ভাঙবে কবে?"

"কি জানি!"

বহিরঙ্গ

১

বহুকালপূর্ব্বে হিমালয় গুহাবাসী একজন লামা একটি টিয়াপাখীর বাচ্ছা কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। পাখীটিকে তুলে নিয়ে গিয়ে তিনি লালন পালন করলেন। পাখীটি যখন বড় হ'ল তখন লামা তাকে সম্বোধন করে' বললেন, "বৎস শুক, এবার তুমি বড় হয়েছ, এবার চরে' খাও গিয়ে। আমি সন্ন্যাসী মানুষ, তোমাকে নিয়ে আর কত দিন বিব্রত হব ?"

শুক জুলজুল করে' লামার মুখের দিকে চেয়ে রইল। লামা বললেন, "তোমাকে মানুষের ভাষায় কথা বলবার শক্তি দিচ্ছি, তুমি মনোভাব ব্যক্ত কর।"

শুক তখন বললে, "প্রভু, কি করে' চরে' খেতে হয় তাতো জানি না। আপনি খাবার দিয়েছেন আমি খেয়েছি। এখন—"

বৃদ্ধ লামা শুকপক্ষীর অসুবিধা হৃদয়ঙ্গম করে' বললেন, "তুমি তাহলে মনুষ্য সমাজে যাও। সেখানে অনেকে শুককে পিঞ্জরাবদ্ধ করে' আনন্দলাভ করেন শুনেছি। যদি তাঁদের কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পার তোমার আহারের অভাব হবে না।"

শুক বললে, "আমার কি এমন গুণ আছে প্রভু যে আমি এমন মহানুভব ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারব!"

বৃদ্ধ লামা দেখলেন সত্যই বেচারা বিপন্ন। সত্যই তো দৃষ্টি আকর্ষণ করবার মতো বিশেষ কোনও গুণ তো ওর নেই। অনেকক্ষণ ভেবে তিনি তখন বললেন "আচ্ছা, তোমাকে তাহলে গোটা দুই বুলি শিখিয়ে দিচ্ছি। সম্ভবত এতেই তোমার কাজ হবে—"

"কি বুলি প্রভু।"

"এস, কানে কানে বলে দি।"

বুলি দুটি প্রথমে কর্ণস্থ এবং পরে কণ্ঠস্থ করে' শুকপক্ষী লামাকে বললে, "বুলি দুটি কোথায় কখন আওড়াব—"লামা বললেন, "সমস্ত বলে দিচ্ছি। এই হিমালয়ের পাদদেশে ভারতবর্ষ নামে এক বিশাল দেশ আছে। খুব ছেলে বেলায় সে দেশে আমি একবার গিয়েছিলাম। প্রধানত দু'রকম জাতেব লোক সে দেশে বাস করে। প্রথম বুলিটি বললে এক জাতের লোকেরা তোমাকে সমাদর করবে, দ্বিতীয় বুলিটি তোমাকে প্রিয় করবে আর এক জাতের লোকের কাছে। যখন যে রকম সুবিধা বুঝবে আওড়াবে।"

শুক বললে, "কে কোন্ জাতের লোক আমি চিনব কি করে"

"বুঝিযে দিচ্ছি তোমাকে। মন দিযে শোন।"

লামা তাঁর বাল্যকালের ধারণা অনুযায়ী বলতে লাগলেন। শুক নিবিষ্টচিত্তে শুনতে লাগল।

২

কিছুকাল পরে শুক পক্ষীটি উড়তে উড়তে ভারতভূমিতে হাজিব হল এসে। অনেক ঘুরে ঘুরেও কে কোন্ জাতেব লোক তা সে নির্ণয করতে পারল না কিন্তু। অধিকাংশ লোকই হাফপ্যাণ্ট বা প্যাণ্ট পরা মাথায় শোলাব হ্যাট বা গান্ধি টুপি, কিংবা ফেজ কিংবা পাগড়ি ··লামার বর্ণনার সঙ্গে একটা মেলে তো আর একটা মেলে না!

অনেক ঘুরে ঘুরে সে শেষে মনঃস্থিব করে ফেললে। বাড়ির চারদিকে মুরগী চরছে, পেঁযাজের গন্ধ উঠছে রান্নাঘর থেকে, দাড়িওলা গৃহস্বামী চেক চেক লুঙ্গী পরে' গড়গড়ায় তামাক খাচ্ছেন, বাড়ীর মেয়েরা সালোযার পবে' ঘুরছে। শুকপাখী নেবে পড়ল চালের উপর এবং ছেলেরা যেখানে খেলছিল সেই দিকে এগিয়ে যেতে লাগল ধীরে ধীরে।

"ওমা কি সুন্দর একটা টিয়া দেখ দেখ।"

রোমাঞ্চিত কলেবরে বসে রইল শুক। ছেলেরা হাততালি দিলে, ঢিল ছুড়লে, নানারকম শব্দ করলে, কিন্তু শুক নড়ল না।

"কারও পোষা টিয়া বোধ হয় তাহলে রে। ধরবি?"

"আমাদের একটা খাঁচাও তো আছে।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, ধরতে পারলে পোষা যাবে।"

শুক ধরা দিলে। মহানন্দে ছেলে মেয়েরা তাকে খাঁচায় পুরে খাবার খেতে দিতে লাগল। শুকেরও আনন্দ হল খুব। সে গদগদ কণ্ঠে লামার শেখানো বুলিটি আউড়ে দিলে—"আল্লা হো আকবর।"

"আমোলো, এটা মোচরমানের বাড়ির পোষা পাখী নিশ্চয়। দূর কর দূর কর দূর কর—"

সত্যিই দূর করে দিলে তারা শুককে।

৩

অনেক ঘুরে ঘুরে শুক দ্বিতীয় আর একটি বাড়ি নির্ব্বাচন করলে কিছু-দিন পরে। গৃহস্বামীর গোঁফ দাড়ি কিছু নেই, গাই দুটিকে খুব যত্ন করেন, নিরামিষাশী, মাথায় সরু একটি টিকি, কপালে তিলক, গলায় কণ্ঠি। বাড়ীতে ছেলে পিলেও নেই বাঁজা বাঁজি। শুকপক্ষী চালে বসতেই বউটি বললে—"ওগো, কার টিয়া পালিয়ে এসেছে বোধ হয়। আহা, ওকে দেখে আমাদের টিয়াটার কথা মনে পড়ছে। আসবার সময় সেটাকেও যদি আনতাম—"

"চুপ।"

তর্জ্জন করে' উঠলেন স্বামী।

"ধরব ওকে—"

শুকপক্ষী আর একটু নেমে এল।

"ওমা, নেবে আসছে।"

আর একটু নেমে এল সে।

"ওগো, হাতের কাছে এসে পড়ল যে। ধরব? একটা খাঁচা চাই যে—"

শুকের কাণ্ড দেখে গৃহস্বামীও বিস্মিত হয়েছিলেন। তিনি বললেন, “এতো আজব চিড়িয়া দেখছি। ধরে ফেল। খাঁচার ব্যবস্থা একটা হবেই...”

শুকপক্ষী পুনরায় পিঞ্জরাবদ্ধ হল। পুনরায় ছোলা ছাতু লঙ্কা পেঁপে দিয়ে সম্বর্দ্ধনা করলে তাকে বউটি। পুনরায় গদগদ কণ্ঠে রোমাঞ্চিত কলেবরে শুকপক্ষী দ্বিতীয় বুলিটি আউড়ে দিলে, “রাধে কৃষ্ণ, রাধে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে—”

বুলি শুনে স্বামী স্ত্রী উভয়েই বিস্ফারিত নয়নে চেয়ে রইল তার দিকে। কি কাণ্ড!

স্বামী বললে, “থাক, এখন কিছু বোলো না।”

গভীর রাত্রে খাঁচার দ্বার খুলে গৃহস্বামী শুক পক্ষীকে বার করলেন এবং বললেন, “কাফের আমাকে রাধাকৃষ্ণ নাম শোনাতে এসেছ? ছদ্মবেশে না হয় হিন্দুস্থানে থাকতেই হয়েছে, তা বলে পাখীর স্পর্দ্ধা সহ্য করব ভেবেছ—”

এই বলে' গলাটি মুচড়ে দিলেন।

৪

অশরীরী শুক লামার কাছে এসে হাজির হল আবার। সমস্ত বর্ণনা করে বললে—

“একি করলে প্রভু—”

“কি করলাম।”

“আপনার সেকেলে ধারণার প্যাঁচে পড়ে' প্রাণটি যে গেল—”

লামা তাঁর মুণ্ডিত মস্তকে একবার হাত বুলিয়ে বললেন, “আরে ভালই তো হল, আর পেটের চিন্তা থাকবে না। এইবার ক্রমশ নির্ব্বাণ লাভ করবে।”

“নির্ব্বাণ? সে আবার কি।”

লামা কোনও উত্তর না দিয়ে মুচকি হাসলেন একটু।

শ্রীহনুমান সিং

গল্পটি পড়িবার পর যে লোকটিকে আপনারা হেয় মনে করিবেন তাহার স্বপক্ষে প্রথমেই কিছু ওকালতি করিতেছি। লোকটি প্রকৃতই ধর্ম-প্রাণ ব্যক্তি। প্রতিদিন দুই ক্রোশ হাঁটিয়া গঙ্গাস্নান করেন। কখনও মিথ্যা কথা বলেন না। তিনি দালাল, ডাক্তার, উকিল, বা রাজনৈতিক নহেন, সুতরাং মিথ্যা কথা বলিবার প্রয়োজনও তাঁহার হয় না। তিনি সুদুর পল্লীগ্রামে চাষবাস লইয়া থাকেন। বেশ বড় গৃহস্থ। কোনপ্রকার বিলাসের ধার ধারেন না। নগ্নপদ, নগ্ন গাত্র। বুক-পিঠ ভরা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল ঢাকিয়া রাখিবার কোন প্রয়াসই তিনি করেন নাই। শোনা যায় জীবনে কোনও অন্যায় কার্যও তিনি করেন নাই, কাহারও অন্যায সহ্যও করেন নাই। কথিত আছে—একবার একটি তস্কর তাঁহার গাছের বেল পাড়িয়াছিল, তিনি নাকি দুই ক্রোশ ছুটিয়া গিয়া তাহাকে ধরেন এবং এমন মার মারেন যে লোকটা সংজ্ঞাহীন হইয়া যায়। কোনপ্রকার অনাচার তিনি সহ্য করেন না।

লক্ষণপুর গ্রামে হনুমান সিংয়েব বাস। সে গ্রামে তাড়ি বা গাঁজার দোকান তো নাইই প্রকাশ্যে বিড়ি সিগাবেটও বিক্রয় হয় না। নানারকম লোক লক্ষণপুব গ্রামে নানারকম নেশার ব্যবসা চালু করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু সুবিধা কবিতে পাবে নাই। কারণ হনুমান সিং নিজে বলিষ্ঠ ব্যক্তি এবং গ্রামস্থ সকলে তাঁহাকে দেবতাব ন্যায় শ্রদ্ধা করে। সুতরাং তাঁহার মতেব বিরুদ্ধে লক্ষণপুব গ্রামে কোনও কিছু করা অসম্ভব। এই নিরক্ষর গ্রাম্য হনুমান সিংকে আমিও শ্রদ্ধা করিতাম। এই খর্বাকৃতি লোকটির এমন একটা ব্যক্তিত্ব ছিল যে স্বতঃই সে সকলের মনে শ্রদ্ধা উদ্রিক্ত করিত।

তাহাকে একদিন বলিয়াছিলাম, "সিংজি, অগর আপ ইংরেজি জানতে তো মিনিস্টর বন্ যাতে"—"আরে রাম রাম। অংরেজি ম্লেচ্ছ ভাষা হ্যায়,

কোন সুখসে ম্লেচ্ছ-ভাষা শিখেঙ্গে। তুলসীদাসজীকি ভাষ্য জানতে হে', ওহি কাফি হ্যায় মেরে লিয়ে—"'কাফি' এবং 'লিয়ে'ও যে ম্লেচ্ছ শব্দ তাহা আর সিংজিকে বলিলাম না। সিংজিকে চটাইয়া লাভ নাই। তাহার দৌলতেই আমার লক্ষণপুরের প্র্যাকটিস একচেটে।

সিংজির একটি মাত্র দোষ ছিল তিনি পট করিয়া চটিয়া যাইতেন এবং চটিয়া গেলে তাঁহার জ্ঞান থাকিত না।

২

সেদিন ডিসপেন্সারিতে আসিয়াই দেখিলাম সিংজি পরম আরামে আমার ডিসপেন্সারির বারান্দায় বসিয়া আছেন। অর্থাৎ একটি গামছাকে বেড় দিয়া কোমর এবং জানুদ্বয়কে একসঙ্গে বাঁধিয়া লইয়াছেন। সিংজি চেয়ারে বসা পছন্দ করেন না। আমরা চেয়ারে বসিয়া যে সুখ পাই সিংজি কোমর এবং হাঁটুকে গামছা-বন্ধনে কায়দা করিয়া লইয়া তদপেক্ষা অধিক সুখ পাইয়া থাকেন। সিংজির পাশেই একটি শীর্ণকান্তি বালক বসিয়াছিল।

"মেরা বেটা হ্যায় ডাকটার সাহেব, দিন দিন শুখ্ যাতা হ্যায়, তবিয়ৎ লাগা কর দেখিয়ে তো ক্যা হুয়া—"

পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম। প্রধান লক্ষণই দেখিলাম রক্তহীনতা। বালকের চোখ-মুখ একেবারে পাণ্ডুর হইয়া গিয়াছে। মনে হইল ইহার মলটা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা দরকার। কৃমির জন্য অনেক সময় এরূপ হয়। সিংজিকে সে কথা বলিলাম। তিনি বলিলেন "হাঁ হাঁ মলমূত্র খুন সব কুছ যাঁচ কর লিজিয়ে—" প্রথমে মল পরীক্ষা করাই স্থির করিলাম।

৩

হুক্ ওয়ার্ম পাওয়া গেল।

হুক্ ওয়ার্মের জন্যই যে ছেলেটির ওই দুর্দশা তাহাতে সন্দেহ রহিল না।

"কেয়া মিলা ডাকটার সাহেব"—সিংজি সোৎসুকে প্রশ্ন করিলেন।

"হুক্ ওয়ার্ম। রোগকা আসল্ কারণ ওহি হ্যায়। আব থোড়া ঠহর যাইয়ে, মায় থোড়িদের কে লিয়ে বাহার যাতা হু'। ঘুরকে আ কর দাবাকা বন্দোবস্ত্ কর দেঙ্গে।"

হনুমান সিং সবিস্ময়ে একবার আমার দিকে, একবার আমার মাইক্রোস্-কোপের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। একটি কথা বলিলেন না। পরমুহূর্তেই তাঁহার ঝাঁকড়া ভ্রূযুগল কুঞ্চিত এবং রোমাচ্ছন্ন নাসারন্ধ্রদ্বয় বিস্ফারিত হইয়া গেল। আমার আর দাঁড়াইবার সময় ছিল না, একটি কলেরা রোগী আমাকে ডাকিতে আসিযাছিল। আমি তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেলাম।

ফিরিয়াই অবিলম্বে বালকটির চিকিৎসা সুরু করিতে হইল। তাহার মাথা কাটিয়া গিয়াছিল, নাক দিয়া রক্তও পড়িতেছিল। সিংজি গর্জন করিতেছিলেন, "হুক্কা পি কর বেমারি বানায়ে হে', শালা। মানা করতে করতে হায়রান গিয়া। কেত্না দফে তুমকো কহা থা—আরে শালা, হুক্কা মৎ পিও। হুক্কা মৎ পিও। ডাক্টার সাহেব যন্তর দেকে পকড় লিহিন হুক্কা বেমারি হুয়া হ্যায়, তবু ভি চালাকি? উল্লু কাহিকা।—"

বুঝিলাম সিংজির ভুল ভাঙাইতে বেশ কিছু সময় লাগিবে, অগ্রে বালকটিকে রক্ষা করা দরকার।

তাহাই করিলাম।

হৃদয়রাজ্যের বিচার

হৃদয়রাজ্যে এখনও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, সেখানে এখনও স্বেচ্ছাচার-তন্ত্র চলিতেছে। বিবেক নামক যে রাজ্যটিকে আমরা সে রাজ্যের সিংহাসনে বসাইয়া রাখিয়াছি তাঁহার চাল-চলন আচার-বিচার কোনও আধুনিক পদ্ধতি মানিয়া চলে না। অথচ তিনি আধুনিক সকল কথাই বেশ মন দিয়া শোনেন। তিনি পণ্ডিত জওহারলালের বক্তৃতা শুনিয়া মুগ্ধ হন। স্তালিনের স্বল্প-ভাষণের স্বপক্ষে মাথা নাড়েন, জনবুল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি চার্চিলকেও তিনি অবজ্ঞা করেন না বরং তাঁহার সাহিত্যিক প্রতিভা তাঁহার অন্তরে পুলকই সঞ্চার করে—কিন্তু কার্য্যকালে দেখা যায় তিনি নিজের মতে নিজের পথে চলিতেছেন। জওহারলাল, স্তালিন বা চার্চিল তাঁহাকে স্বপথ হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতে পারে নাই।

···একবার ট্রেণে যাইতেছিলাম। একটা বড় ষ্টেসনে গাড়ী দাঁড়াইয়াছিল। খদ্দরি স্যুট পরিহিত এক হোটেলওয়ালা আসিয়া উপস্থিত হইল। সসম্ভ্রমে বলিল, ভারতীয় কৃষ্টি সর্ব্বসমন্বয়-মূলক আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সে ইটালিয়ান পাচকের সাহায্যে মোচা দিয়া এক রকম অভিনব ফ্রেঞ্চ কাটলেট প্রস্তুত করাইয়াছে। দেশ-প্রেমিক মাত্রেরই উচিত তাহা একবার আস্বাদন করিয়া দেখা। হৃদয়রাজ্যের অধিপতি কথাগুলি স্মিতমুখে শুনিলেন, কিছু বলিলেন না। হোটেলওয়ালা চলিয়া গেল। তাহার পর আসিল একজন নিখুঁত স্বদেশী মিষ্টান্ন-বিক্রেতা। মাথায় খদ্দরের পাগড়ি, গায়ে খদ্দরের আল্‌খাল্লা, পায়ে অনলঙ্কৃত মহিষ চর্ম্মের পাদুকা। রাষ্ট্রভাষা হিন্দিতে সে যাহা নিবেদন করিল তাহার বাংলা সারমর্ম্ম এই :—স্বদেশী ইক্ষু হইতে প্রস্তুত স্বদেশী গুড় এবং স্বদেশী চাউল হইতে প্রস্তুত চৌরাট্টা (চাউল-চূর্ণ)। এই উভয়বস্তুকে একত্রিত করিয়া সে নিখুঁত স্বদেশী সন্দেশ প্রস্তুত করিয়াছে। স্বাধীন

ভারতের প্রত্যেক জীবিত ব্যক্তিরই উচিত—ইত্যাদি। বিবেক হাসিমুখে মাথা নাড়িলেন, কিন্তু সন্দেশ কিনিবার আদেশ দিলেন না। একটু পরে ক্ষুধা আসিয়া আবেদন জানাইল—কি খাইব? বিবেক বলিলেন, কিছু কলা এবং পেয়ারা কিনিয়া ফেল। ক্ষুধা হাসিমুখে তাহাই করিল। ইহাও এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। কাগজে দেখি আজ অমুক মন্ত্রীর বিরুদ্ধে 'নো কনফিডেন্স', তমুক নেতার বিরুদ্ধে ধর্ম্মঘট, হৃদয়রাজ্যে কিন্তু ওসবের নাম গন্ধও নাই। সকলেই হাসিমুখে ওই স্বেচ্ছাচারীটার আদেশ অবনত মস্তকে পালন করিয়া কৃতার্থ হয়।

ভূমিকায় আপনাদের অনেকখানি সময় নষ্ট করিয়া ফেলিলাম, আসল গল্পটা এখনও আরম্ভই করি নাই। গল্পটা এবার শুনুন।

আমি ডাক্তার। আমাদের ক্ষুধার সুযোগ লইয়া খাদ্য-বিক্রেতারা যেমন নিজেদের বহুবিধ ক্ষুধা তৃপ্ত করে, আমাদের লজ্জার সুযোগ লইয়া বস্ত্র-বিক্রেতারা যেমন লাল হইয়া যায় আমিও তেমনি মানুষের অসুস্থতার সুযোগ লইয়া নিজেকে প্রায় অসুস্থ করিয়া তুলিয়াছি। আধুনিক শহরে প্রকাশ্য দিবালোকে অথবা অর্দ্ধ-আলোকিত রাত্রির অন্ধকারে যে স্থানে স্বর্গ এবং নরক পাশাপাশি প্রকট হইয়া ওঠে রাজপথ নামক আধুনিক সেই তীর্থের একপাশে বহুদিন যাবৎ আমিও আমার 'সুলভ ক্লিনিক' নামক ঔষধালয়টি খুলিয়া বসিয়া আছি। বাত এবং ডায়াবিটিস এই উভয় প্রকার দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি বহুদিন হইতে আমাকে পাড়িয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে। এখনও তাহারা সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। এখনও উঠিয়া হাঁটিয়া বেড়াইতে পারি। ডাক্তারী জীবনের আনন্দবিষাদের কাহিনী শুনাইয়া আপনাদের অমূল্য সময় নষ্ট করিব না শুধু ডাক্তারি অভিজ্ঞতা হইতে একটি গল্প বলিব।

একবার একটি বৈজ্ঞানিক ব্যক্তির দর্শন লাভ করিয়া ছিলাম। তিনি শুধু বৈজ্ঞানিক নন, তিনি ন্যায়নিষ্ঠ, সহৃদয় এবং আধুনিক। পরিধানে প্যান্ট এবং 'বুশসার্ট, চোখে রঙীন চশমা। অর্থনৈতিক চাপের জন্যই তিনি

যে বাধ্য হইয়া এই অদ্ভুত বেশ ধারণ করিয়াছেন তাহা দেখিলেই বোঝা যায় এবং বুঝিলেই কষ্ট হয়।

সেদিন সকাল হইতে একটিও রোগী আসে নাই। বহমান পথ-নদী-স্রোতে দৃষ্টির ছিপ ফেলিয়া চিন্তা করিতেছিলাম আমাদের নব-নির্ব্বাচিত স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহাশয়ের কর্ম্মনিপুণতাই কি ইহার কারণ? ঘর্ঘরশব্দে বিমান পথে উড়িয়া উড়িয়া দেশের স্বাস্থ্যসম্পদ ফিরাইয়া দিয়া তিনি কি ডাক্তারদের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছেন? তাহা যদি হয় আগামীবারে চেষ্টা করিতে হইবে লোকটা যাহাতে ভোট না পায়। লোকটা···। চিন্তাধারাকে ব্যাহত করিয়া উক্ত ভদ্রলোক প্রবেশ করিলেন।

"আপনিই কি ডাক্তারবাবু—"

"আজ্ঞে হ্যাঁ"

"নমস্কার, আপনার কাছেই এলাম।"

"নমস্কার। বসুন—"

ভদ্রলোকের দৃষ্টি হইতে এক ঝলক সহৃদয়তা যেন চলকাইয়া পড়িল। আমার দিকে আর একবার হাস্যদীপ্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "এখানকার সিভিল সার্জনের সঙ্গে আমার খুব আলাপ আছে। ডাক্তার সরকারও খুব অন্তরঙ্গ লোক আমার কিন্তু আপনার কাছেই এলাম আমি। আপনার খুব নাম শুনেছি—"

আর এক ঝলক সহৃদয় দৃষ্টি চলকাইয়া পড়িল এবং এবার সেটা যেন সূক্ষ্মমূর্ত্তি ধারণ করিয়া আলতো আলতো ভাবে আমার পিঠ চাপড়াইতে লাগিল।

বিগলিত হইয়া বলিলাম, "বলুন আমাকে কি করতে হবে—"

"আমার 'ওয়াইফ'কে দেখতে হবে একবার। আপনার সময় আছে কি এখন, যেতে পারবেন?"

"সময় আছে। কি হয়েছে আপনার স্ত্রীর—"

"কাসি আর জ্বর"

"ও। কখন জ্বর হয়"

"সন্ধ্যার দিকে"

"কতদিন থেকে ভুগছেন"

"তা প্রায় তিনমাস"

"বেশ চলুন, দেখে আসি"

যাহা প্রত্যাশা করিয়াছিলাম গিয়া তাহাই দেখিলাম; কিন্তু আর একটা জিনিষ দেখিলাম যাহা অপ্রত্যাশিত। ইতিপূর্ব্বে যক্ষ্মাগ্রস্ত স্ত্রীলোক অনেক দেখিয়াছি, তাহাদের স্বামীদের আচরণ লক্ষ্য করিবার সুযোগও একাধিকবার মিলিয়াছে, কিন্তু এমন বৈজ্ঞানিক মনোভাবসম্পন্ন স্বামী কখনও দেখি নাই। দেখিলাম ছাতে চিলে কোঠার ঘরটিতে স্ত্রীকে রাখিয়াছেন। সেখানে তিনি বিশুদ্ধ বাতাস এবং নিঃশব্দ নির্জ্জনতা উপভোগ করেন। তাঁহার বাসনপত্র, কাপড়-চোপড় সমস্ত আলাদা। স্ত্রীকে তিনি বিছানা হইতে উঠিতে পর্য্যন্ত দেন না। নীচে দেখিলাম একটি কমবয়সী চাকরানী গৃহের যাবতীয় কাজকর্ম্ম সামলাইতেছে। ঘরে ঢুকিবার পূর্ব্বে ভদ্রলোক বুশ সার্টের পকেট হইতে রুমাল ও ছোট শিশি বাহির করিলেন। শিশির ছিপি খুলিয়া রুমালে ইউক্যালিপ্‌টাস্‌ অয়েল ঢালিলেন, গন্ধ হইতেই তাহা বুঝিলাম। যতক্ষণ ঘরের ভিতর রহিলেন, রুমালটা নাকের সামনে ধরিয়া রাখিলেন।

যথারীতি আমি বলিলাম, "স্পিউটাম্‌টা পরীক্ষা করতে হবে—এক্সরে করালেও ভাল হয়।"

"দুই করানো হয়েছে"

"দেখি"

দেখিলাম কফে যক্ষ্মার বীজাণু পাওয়া যায় নাই। এক্সরের ছবিতে এক জায়গায় সন্দেহজনক একটু কালো দাগ আছে।

পুনরায় বলিলাম, "স্পিউটামটা আর একবার পরীক্ষা করতে চাই।"

"বেশ। স্পিউটাম রাখাই আছে। ওই যে—"

দেখিলাম একটি মুখবন্ধ শিশিতে খানিকটা কফ রহিয়াছে।

ভদ্রলোক বলিলেন, "ওকে বাইরে থুতু ফেলতে মানা করেছি, ওই শিশিতে ফেলে মুখ বন্ধ করে রেখে দেয়, আগে শিশিটায় 'লাইসল' দিয়ে রাখতাম, কিন্তু একদিন ঠোঁটে লেগে গিয়েছিল, তাই এখন এমনিই রাখে। শিশিটা ভরে গেলে ওটা পুড়িয়ে ফেলি—।"

মুগ্ধ হইলাম।

"আপনি ওটা নিয়ে আসুন তাহলে—"

"আচ্ছা"

চলিয়া আসিলাম। একটু পরে ভদ্রলোক স্পিউটাম লইয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলাম চার পাঁচ পুরু ন্যাকড়া দিয়া বাঁধা শিশিটাকে বাইকের হাতলে ঝুলাইয়া আনিয়াছেন। অতি সন্তর্পণে সেটা বাইকেব হাতল হইতে খুলিয়া বাম হস্তে দুইটি অঙ্গুলিতে ঝুলাইয়া ঘবেব ভিতর ঢুকিলেন।

"কোথা বাখব বলুন—"

"ওই টেবিল"

টেবিলে রাখিয়া হাতটা তুলিয়া রহিলেন।

"সাবান আছে—"

"আছে। জলও ওই বালতিতে আছে—"

প্রায় এক বালতি জল এবং কার্বলিক সাবানটার প্রায় অর্দ্ধেক শেষ করিযা ফেলিলেন।

"একটু স্পিরিট আছে ?"

"আছে—"

"দিন তো—"

বেশ খানিকটা স্পিরিট লইয়া নিজের হাতে এবং বাইকেব হাতলে অনেকক্ষণ ধবিয়া লাগাইলেন।

"সাবধানে থাকাই ভাল, কি বলেন—"

"নিশ্চয়"

"কখন আসব"

"ঘণ্টা দুই পরে"

আমিও অনেকক্ষণ চেষ্টা করিয়া যক্ষ্মার জীবাণু আবিষ্কার করিতে পারিলাম না।

ঘণ্টা দুই পরে ভদ্রলোক আসিলেন।

"পেলেন কিছু"

"না, পেলাম না"

"কি করা যায় তাহলে বলুন। এক্সরে দেখে কিন্তু সন্দেহ হয়, দেখলেন তো। আচ্ছা, স্যানাটোরিয়ামে পাঠিয়ে দিলে কেমন হয়"

"খুব ভাল হয়—"

"যাদবপুরে আপনার পরিচিত কেউ আছেন"

"আছেন একজন"

"একটা চিঠি লিখে দেবেন স্যার দয়া করে"

"দেব। কাল আসবেন"

"আপনার 'ফি'টা এখনও দেওয়া হয় নি। কত দেব"

"দশ টাকা"

"দশ টাকা? আমি শুনেছিলাম পাঁচ। বেশ, দশ টাকাই নিন। আপনার ন্যায্য পাওনা থেকে আপনাকে বঞ্চিত করবার ইচ্ছে নেই"

পকেট হইতে ব্যাগ বাহির করিলেন এবং গণিয়া গণিয়া দশখানি এক টাকার নোট বাহির করিয়া দিলেন। মুখভাব দেখিয়া মনে হইল যেন কোনও মহৎ কর্ম্ম করিলেন।

"টাকাটা গুণে নিন। কাল সকালেই আসব কি"

"আসবেন"

ভদ্রলোক চলিয়া গেলেন।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছিল। আমার ডিসপেন্সারির সম্মুখে পথের ধারে মিউনিসিপালিটির যে বর্ত্তিকাটি প্রতিদিন প্রজ্বলিত হইয়া যৎসামান্য আলোক বিতরণ করে সে দিন কেন জানি না সেটি জ্বলে নাই। তাই

বারান্দার এক কোণে উপবিষ্ট কুস্‌মিকে দেখিতে পাই নাই। ভদ্রলোক চলিয়া গেলে কুসমি সামনে আসিয়া দাঁড়াইল।

কম্পাউণ্ডার বাবু বলিলেন, "অনেকক্ষণ থেকে বসে' আছে আপনার সঙ্গে দেখা করবে বলে'। খানিকটা কফ এনেছে পরীক্ষা করার জন্যে—"

কুসমির স্বামীর চিকিৎসা করিয়াছিলাম, তাহাকে চিনিতাম। এবার যেন তাহার আরও দুরবস্থা লক্ষ্য করিলাম। পরনে চিট্‌চিটে ময়লা কাপড়, মাথার চুল রুক্ষ, চক্ষু দুইটি লাল। আমার সামনে আসিয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। কাঁদিয়া কাঁদিয়াই সম্ভবত চক্ষু দুইটি লাল হইয়াছিল।

বলিল, তাহার এক সৎ বোনকে সে ছেলেবেলা হইতে মানুষ করিয়াছিল। সর্ব্বস্বান্ত হইয়া কিছুদিন পূর্ব্বে তাহার বিবাহও দিয়াছিল। কিন্তু এমনি তাহার পোড়াকপাল তিন দিন পূর্ব্বে হঠাৎ কাসিতে কাসিতে তাহার দুলালীর মুখ দিয়া রক্ত বাহির হইয়াছে, কিছুতেই রক্ত বন্ধ হইতেছে না। জ্বরও হইতেছে। আমি যদি দয়া করিয়া কফটা পরীক্ষা করিয়া দেখি—।

দেখিলাম সে একটি মাটির সরায় এক সরা রক্তাক্ত কফ নিজের কাপড় দিয়া ঢাকিয়া আনিয়াছে। কাপড়েও খানিকটা কফ লাগিয়া গিয়াছে।

আমি তাহাকে বৈজ্ঞানিক যুক্তি দেখাইয়া সতর্ক করিলাম।

সে বলিল, "ডাক্তারবাবু, আমার দুলালীই যদি না বাঁচে আমার বেঁচে কি হবে"

পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম যক্ষ্মার জীবাণুতে ভরা। কুসমি বলিল, "ডাক্তারবাবু, আপনাকে আর একটি অনুরোধ করছি। ওর স্বামী যদি আসে তাকে বলবেন না যেন, ওর এই কাল ব্যাধি হয়েছে। তাহলে ও একে ছেড়ে দিয়ে ঠিক আর একটা বিয়ে করবে। সে আপনার কথা খুব মানে, দোহাই আপনার তাকে সত্যি কথাটা বলবেন না।"

পা জড়াইয়া ধরিল।

নিরুপায় হইয়া প্রতিশ্রুতি দিলাম।

মেয়েটি আঁচলে আমার 'ফি' বাঁধিয়া আনিয়াছিল। একগাদা রেজকি।

পয়সা, ডবল-পয়সা, আনি দুয়ানি আর সিকি। দেখিলেই মনে হয় সে অনেক দিনের সঞ্চিত এই পয়সাগুলি সৎ বোনটির জন্য খরচ করিতেছে।

বলিলাম, "তোকে আর ফি দিতে হবে না—"

"সে কি হয় ডাক্তার বাবু, আপনাকে ফি দেবার সামর্থ্য কি আছে আমার" রেজকিগুলি টেবিলের উপর ঢালিয়া দিল।

"আপনার পুরো ফি আনতে পারি নি বাবু—"

"ওগুলোও নিয়ে যা না—"

"না বাবু কিছু না নিলে আমার তৃপ্তি হবে না"

ঔষধ লইয়া ও ঔষধের পুরা দাম দিয়া কুসমি চলিয়া গেল।

২

রাত্রে শুইয়া আছি। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ। শুনিতে পাইলাম হৃদয়রাজ্যের অধিপতি বিবেক শ্রদ্ধাকে ডাকিয়া প্রশ্ন করিতেছে—"আজ কাকে তোমার পূজোর ঘরে বেদীতে বসিয়েছ—"

"কাউকে বসাই নি এখনও—"

"কাকে বসাবে"

"আপনি যাকে বলবেন"

"ওই কুসমিকে বসাও"

"সেই বৈজ্ঞানিক ভদ্রলোককে ?"

"না"

কাণ্ড দেখুন !

চতুরীলাল

চতুরীলালের নাম আপনারা নিশ্চয় শোনেন নাই। আমিও শুনি নাই। সে নিজেই আসিয়া সেদিন নিজের পরিচয় ব্যক্ত করিল। বলিল, তাহার দূরসম্পর্কের কোন এক আত্মীয় নাকি আমার চিকিৎসায় দুই বৎসর পূর্বে ভাল হইয়া গিয়াছিল। তাহারই সুপারিশে সে আমার নিকট আসিয়াছে নিজের চিকিৎসা করাইবার জন্য।

বলিলাম, "আপনার হয়েছে কি—"

চতুরীলাল সহসা হাত দুটি জোড় করিয়া ফেলিল।

"সব কথা বলবার আগে একটা কথা জানতে চাই হুজুর। আপনার 'ফিস্' কত ?"

"দশ টাকা।"

"দশ টাকা দিতে আমার জিব বেরিয়ে যাবে ডাক্তারবাবু। কিছু কম করুন।"

"আপনি সত্যিই যদি দশ টাকা দিতে না পারেন, কম করব বইকি। খুব গরীব যদি হন একেবারেই কিছু নেব না—"

এই কথায় চতুরীলালের চোখে-মুখে যে ভাব পরিস্ফুট হইল, তাহা অপূর্ব। তাহা শ্রদ্ধা, যাহা-ভাবিয়াছিলাম-তাই-ব্যঞ্জক একটা ভাব এবং চতুরতার এক অবর্ণনীয় সমন্বয়। ঘাড়টা অন্যদিকে ফিরাইয়া স্মিতমুখে সে বামগুম্ফ-প্রান্তে ধীরে ধীরে তা দিতে লাগিল। অর্থাৎ ভাবিতে লাগিল অতঃপর কি বলা যায়।

আমি আর একটি রোগী লইয়া পড়িলাম। তাহাকে বিদায় করিয়া চতুরী-লালের দিকে চাহিলাম আবার। চতুরীলাল বলিল, "আমার বাড়ির কাছেই একজন ভাল ডাক্তার আছেন। তিনিও এম-বি-বি-এস। কিন্তু আমি তাঁর

কাছে যাইনি, আপনার কাছেই এসেছি। আসতে আমার খরচ লেগেছে তিন টাকা বারো আনা। ট্রেনভাড়া আড়াই টাকা, জলখাবার এক টাকা, রিক্সভাড়া চার আনা। ফিরে যেতেও প্রায় ওই খরচই লাগবে। আপনি ফিস কিছু কম করুন ডাক্তারবাবু। ছুটি টাকা আপনাকে দেব আমি।"

"আমি তো বলছি সত্যি যদি আপনার দেবার ক্ষমতা না থাকে, ও ছু'টাকাও দিতে হবে না। আপনার বিবেক যা বলে তাই করুন। আমি আর কি বলব আপনার মতো ভদ্রলোককে।"

চতুরীলাল এই কথায় নীচের ঠোঁটটি উপরের ঠোঁট দিয়া চাপিয়া ধরিল। তাহার পর বারান্দায় গিয়া নাকটা ঝাড়িয়া আসিল। তাহার পর স্মিতমুখে বলিল, "রাজেন্দর সিং আমাকে বলেছিল, আপনি দয়ার সাগর। যে যা দেয় নিয়ে নেন।"

"আগে হয়তো দয়ার সাগর ছিলাম। কিন্তু ক্রমশই জিনিসপত্রের দাম যে-রকম বেড়ে যাচ্ছে, তাতে সাগর আর থাকতে পাচ্ছি কই, ডোবা হয়ে যাচ্ছি—।" চতুরীলাল উচ্ছ্বসিত আনন্দে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

"ঠিক বলেছেন, সকলেরই অবস্থা সমান। আমার কিছু জমি আছে, ধান মন্দ হয়নি, দামও পেয়েছি খারাপ নয়, কিন্তু খরচ—"

চতুরীলালের খরচের বর্ণনা শুনিবার অবকাশ পাইলাম না। পরিচিত এক ভদ্রলোক মোটরযোগে হন্তদন্ত হইয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার শালীর নাকি নাভিশ্বাস উঠিয়াছে। ভদ্রলোক চাকুরি করেন। ভাল চাকুরি। ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। কিন্তু তাঁহার স্কন্ধে ডালপালাসমেত গোটা শ্বশুরবাড়িটাই আসিয়া ভর করিয়াছে। তাহারা পাকিস্তানী এবং বাস্তহারা, বলিবার কিছু নাই। শালীটি আসিয়াই টাইফয়েডে পড়িয়াছে।

চতুরীলালকে বলিলাম, "আপনি একটু বসুন। আমি আসছি এখনি—"

চলিয়া গেলাম। একটা ইনজেকশন দেওয়ার পর ভাগ্যক্রমে শালী সামলাইয়া গেল। ফিরিলাম প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে। দেখিলাম চতুরীলাল

তখনও বসিয়া আছে। বারান্দায় আর একটি রোগিনীও আসিয়া জুটিয়াছে। তাহার নাকটা ফোলা, চোখ দুইটি লাল, মুখময় অসংখ্য ছোট ছোট গুটি। মেয়েটি আমাকে দেখিয়া ঘোমটা টানিয়া সরিয়া বসিল।

চতুরী বলিল, "আপনাকে পাঁচ টাকা দেব ডাক্তারবাবু। নিন, এবার আমার কথা শুনুন—।" রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল। কিন্তু রাগ প্রকাশ করাটা শোভন নয়।

হাসিয়া বলিলাম—"পাঁচ টাকার বেশি দেবার আপনার ক্ষমতা নেই নাকি, সত্যি ?"

চতুরীলাল মুচকি হাসিয়া চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, "আমি রাজেন্দ্র সিংয়ের আত্মীয়। আমাকে কিছু খাতির করবেন না ?"

আমিও উত্তরে মুচকি হাসিলাম। আমার হাসি দেখিয়া মরীয়া হইয়া চতুরীলাল বলিল—"বেশ, আপনার কথাও থাক, আমার কথাও থাক। ছ'টাকা—" গণিয়া গণিয়া ছ'টি টাকা সে আমার সম্মুখে রাখিয়া হাত জোড় করিল।

"বেশ কি হয়েছে বলুন—"

চতুরীলাল তাহার রোগের বিবিধ বর্ণনা শুরু করিল। বর্ণনা শুনিয়া বুঝিলাম চতুরীলাল সম্ভবত বহুমূত্র ব্যাধিতে কাবু হইয়াছেন। প্রস্রাব পরীক্ষা করিলাম, প্রচুর চিনি।

"খুব খান নাকি ?"

"খুব। ছেলেবেলায় খেতে পাই নি। এখন ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন, আপনার আশীর্বাদে খাবার অভাব নেই এখন। খুব খাই"

চতুরীলালের মুখ হাস্যোদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

"কিন্তু আপনার যা অসুখ হয়েছে, তাতে বেশি খাওয়া তো চলবে না। খাওয়া কমাতে হবে।"

"সেটি পারব না হুজুর। ছেলেবেলায় বাবা মারা গেলেন, ধারে তাঁর মাথার চুল পর্যন্ত বিকিয়ে গিয়েছিল। একবেলা খাওয়া, তাই জুটত না সব দিন।

এখন আপনার আশীর্বাদে সামলে উঠেছি অনেকটা। ঘরে গাই আছে, ধান হয়, আলু হয়, আখ হয়—এখন যদি আবার আপনি খাওয়া বন্ধ করে দেন, তাহলে—"

হাত উল্টাইয়া এবং মুচকি হাসিয়া চতুরীলাল বক্তব্য শেষ করিল।

"কিছুদিন সংযম করুন। চিনি, ভাত, আলু এই তিনটে অন্তত ছেড়ে দিন—"

"ওই তিনটেই তো প্রিয় খাদ্য আমার। ও তিনটে ছেড়ে দিলে খাব কি—"

"তাহলে ইনজেকশন নিন। কিন্তু তার আগে আপনার রক্তটা দেখা দরকার, রক্তে চিনির পরিমাণ কত আছে।"

"রক্তেও চিনি থাকে না কি?"

"থাকে বইকি। রক্তে চিনির পরিমাণ বেশী হলেই তো সেটা পেচ্ছাপ দিয়ে বেরোয়—"

"ও—"

চতুরীলাল পুনরায় কিছুক্ষণ গুম্ফপ্রান্ত পাকাইয়া অবশেষে বলিল—"তার মানে খরচ "

"অনেক খরচ। রক্ত পরীক্ষা করতেই ষোল টাকা লাগবে। তারপর ইনজেকশন পিছু খরচ আছে। রোজ অন্তত একটা করে ইনজেকশন দিতে হবে। বেশ খরচ এতে। তার চেয়ে কিছুদিন সংযম করেই দেখুন না—"

চতুরীলাল নীরবে গোঁফে তা দিতে লাগিল। তাহার পর সহসা আমার হাত দুইটি চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "রক্ত পরীক্ষার জন্যে আমি আট টাকার বেশি দিতে পারব না। দয়া করুন একটু—করতেই হবে—"

করিতেই হইল। বুঝিলাম শক্ত পাল্লায় পড়িয়াছি।

চতুরীলালের রক্ত লইলাম। বলিলাম, "আপনি বিকেলে এসে আমার সঙ্গে দেখা করবেন। রক্তটা পরীক্ষা করে তারপর আপনার ব্যবস্থা করব।"

বারান্দায় যে মেয়েটি এতক্ষণ আধ-ঘোমটা দিয়া বসিয়াছিল, সে এবার

আসিয়া ঘরে ঢুকিল এবং অত্যন্ত নাটকীয় ভঙ্গীতে একেবারে আমার পা দুইটা জড়াইয়া ধরিল।

"বাঁচান বাবু আমাকে—"

"কি হয়েছে বল আগে, পা ছাড়, পা ছাড়—"

পা ছাড়িয়া সে নতমুখে উঠিয়া দাঁড়াইল।

"ঘোমটা সরাও, দেখি কি হয়েছে—"

দেখিলাম। সংশয় রহিল না, কি হইয়াছে। সিফিলিস। চতুরীলালও ব্যায়ত আননে তাহার দিকে চাহিয়া ছিল। মেয়েটিকে বলিলাম, "তোমার যা হয়েছে, তা সারাতে গেলে অনেক খবচ করতে হবে। পারবে?"

মেয়েটি দুইটি রূপার বালা আঁচলের তলা হইতে বাহির কবিয়া আমার টেবিলের উপব বাখিল।

"এই আমার যথাসর্বস্ব। এই নিয়ে আমার অসুখটা সারিয়ে দিন আপনি ডাক্তারবাবু।"

"বালা নিয়ে কি করব। আমাকে কিছু দিতে হবে না তোমাব। ওষুধের যা ন্যায্য দাম—তাই জোগাড় কব—"

"কত দাম—"

"ভাল করে চিকিৎসা করলে প্রায পঞ্চাশ টাকা পড়বে। তোমার রক্তটাও পরীক্ষা করতে হবে—"

"তার কত লাগবে?"

"দশ টাকা। তা-ও না হয় আমি ছেড়ে দেব। ওষুধের দাম কিন্তু লাগবেই......"

মেয়েটি নীরবে অশ্রুমোচন করিতে লাগিল।

"বালা দুটোর দাম কত?—"

"আমি তিরিশ টাকা দিয়ে কিনেছিলাম অনেকদিন আগে। এখন বেচতে গেলে কি দাম পাব জানি না।"

চতুরীলাল বলিল—'দশ টাকার বেশি কেউ দেবে না—ভিতরে গালা আছে—"

মেয়েটি আবার আমার পা জড়াইয়া ধরিবার চেষ্টা করিল। তাহাকে নিবৃত্ত করিয়া বলিলাম—"তুমি বাইরে বস। দেখি আমি কি করতে পারি। হাসপাতালে একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি, দেখ সেখানে যদি বিনাপয়সায় কোনও ব্যবস্থা হয়—"

"সেখানে গিয়েছিলাম। তারাও টাকা চায়—"

"তবে আর কি হবে—"

মেয়েটি চোখে আঁচল দিয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

"কেঁদে কি হবে, আচ্ছা বাইরে গিয়ে বস, দেখি কি করতে পারি।"

কিছুদিন পূর্বে এক বিলাতী কম্পানি কিছু ঔষধ বিনামূল্যে নমুনাস্বরূপ পাঠাইয়াছিল। ভাবিতেছিলাম তাহাই কাজে লাগাইব।

সহসা চতুরীলাল বলিয়া উঠিল,—"আচ্ছা ডাক্তারবাবু, পঞ্চাশ টাকা খরচ করলে ও সেরে যাবে?"

"যাবে—"

চতুরীলাল পুনরায় বামগুম্ফ-প্রান্ত ধরিয়া টানিতে শুরু করিল। ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিল,—"দিন ওকে ওষুধ। দাম আমি দেব—"

"আপনি?"

চতুরীলাল কিছু না বলিয়া কোমর হইতে একটি গেঁজে বাহির করিয়া পাঁচ-খানি দশ টাকার নোট আমার হাতে দিল।

হাসিয়া বলিল, "মায়া জিনিসটা বড় খারাপ ডাক্তারবাবু। মায়াই ডুবিয়েছে আমাদের—"

চতুরীলালের মুখে এ প্রকার জ্ঞানগর্ভ কথা শুনিব প্রত্যাশা করি নাই। একটা সন্দেহ হইল।

"আপনার, কেউ হয় না কি?"

"না। তবে—"

চতুরীলাল ইতস্তত করিতে লাগিল।

"খুলেই বলুন না, ব্যাপারটা কি—"

"ব্যাপার কিছুই নয়। ওর মুখটা আমার মায়ের মুখের মতো অনেকটা—"

তাহার পর গলা-খাঁকারি দিয়া বলিল, "বাবা মারা যাবার মাসখানেক পরে মা-ও মারা যান। তখন আমাদের অবস্থা এত খারাপ, মায়ের কোন চিকিৎসাই করাতে পারি নি—"

সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিলাম, চতুরীলালের চোখের কোণে অশ্রু টলমল করিতেছে।

বাল্মীকি

অনেক দূর হাঁটিয়া আসিয়া দেখিতেছি কপাট বন্ধ। শস্তায় হইবে বলিয়াই এত কষ্ট করিয়া এতদূর হাঁটিয়া আসিয়াছি। ইলেকট্রিক বেলের বোতামটি টিপিয়া দাঁড়াইয়া আছি। বিজন যদি থাকে নিশ্চয়ই নামিয়া আসিবে। ইতিমধ্যে আমার গল্পটি শুনুন।

আমি মশায় একটু মিতব্যয়ী লোক। বাজে খরচ করিবার আমার প্রবৃত্তি নাই। আমি যখন লোক খাওয়াই ঠিক নিক্তির ওজনেই আয়োজন করি। যিনি মিষ্টান্ন খাইবেন না তাঁহার নিষেধ সত্ত্বেও তাঁহার পাতে সন্দেশ-রসগোল্লা ঢালিয়া দিয়া বাহাদুরি দেখাইবার ইচ্ছা আমার হয় না। যে দরজি কম কাপড় লইয়া জামা করিতে পারে আমি তাহার কাছেই যাই। দুই গিরা কাপড় বাঁচাইবার জন্য দুই ক্রোশ হাঁটিতেও আমার আপত্তি নাই। একটি ব্লেডে আমি তিনমাস চালাই। একটু সাবধানতা অবলম্বন করিলেই চালানো যায়। ছেঁড়া কাগজের টুকরা আমি ফেলি না, তাহার যতটুকু অংশ শাদা আমি তাহা সানন্দে কাজে লাগাই। খামে চিঠি আসিলে খামগুলিও আমি সযত্নে রক্ষা করি এবং সুযোগ পাইলেই কাজে লাগাই। যে সব দোকান দোকানরূপী যূপকাষ্ঠ সে সব দোকানে আমি কখনও গলা বাড়াইয়া দিই না। অথচ আমি যে বেরসিক তাহাও নয়। মাঝে মাঝে এক আধটা সৌখীন জিনিস কিনি বই কি। সেদিন যেমন একটা মরক্কো চামড়া দিয়া বাঁধানো ছোট হিসাবের খাতাই কিনিয়া ফেলিলাম। সাধারণ একটা খাতা হইলেও চলিত, কিন্তু জানেনই তো লোভেই পা হড়কাইয়া যায়। পা হড়কাইবার মুখেও কিঞ্চিৎ সাবধানতা অবলম্বন করিয়া গালটি বাঁচাইয়াছি। বিশুর দোকানে কিনিলে সে ঠিক গালে চড় মারিত। চিরন্জিলালের দোকানে গিয়া নগদ চার আনা বাঁচাইয়াছি। কোথায় কোন্ জিনিষ শস্তায় পাওয়া

যায় তাহা আমার নখদর্পণে। একটা ভুল ধারণা হয়তো ইতিমধ্যে আপনাদের মনে শিকড় গাড়িয়াছে। আপনারা হয়ত অনুকম্পাভরে ভাবিতেছেন ছয় পুত্র— আট কন্যা—খাণ্ডার গৃহিনীর মালিক আমি, ন্যুব্জপৃষ্ঠ হইয়া নতগুম্ফে মিতব্যয়ের সঙ্কীর্ণ পথে কোনক্রমে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেছি। মোটেই তাহা নয়। আমার তিনকূলে কেহ নাই। এই সেদিন পর্যন্ত ব্যাচিলর ছিলাম। সম্প্রতি, মানে মাস দুই আগে, বিবাহ করিয়াছি।

বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়াছি। না, না, আপনারা যাহা ভাবিতেছেন তাহা নয়। বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়াছি অন্য কোন কারণে নয় আমার চাকর গোবর্ধনের জ্বালায়। ব্যাটা ভয়ানক চোর। চাল, ডাল, নুন, তেল, আলু, পটল এমনকি পানের ভিতর হইতে সুপারী পর্যন্ত সরায়। আর কিছু না পারুক দুই চারিটা দেশলাইয়ের কাঠি তো পার করিবেই। একা তাহাকে সামলাইতে পারি এমন ক্ষমতা আমার নাই। দালালি করি, সমস্ত দিন বাহিরে বাহিরে কাটাইতে হয়। ভাবিলাম ঘরে একটা লোক থাকা দরকার।

আমার সদ্য-পরিণীতা পত্নীর নাম শ্রীমতী মনোমোহিনী দেবী। আজকাল নারীমাত্রেই দেবী, মনোমোহিনীকে আমার সম্রাজ্ঞী পদবীতে ভূষিত করিতে ইচ্ছা করে। মনোমোহিনী রূপসী, কিন্তু রূপের জন্যই তাহাকে ধর্মপত্নীত্বে বরণ করি নাই। অনার্স লইয়া বি-এ পাশ করিয়াছে বলিয়া।

প্রথম সঙ্কোচটা কাটিয়া যাইবার পর তাহার সহিত আমার নিম্নলিখিত-রূপ আলাপ হয়।

"তোমার শাড়ীটা তো বেশ চমৎকার। দাম কত?"

"সাতাশ টাকা—"

"সাতাশ টাকা! বল কি! কোন্ দোকান থেকে কিনেছিলে—"

"ধনেখালি শাড়ীর তো এইরকমই দাম। পিসিমা দিয়েছেন এটা। কোন্ দোকান থেকে কিনেছিলেন জানি না।"

"ঠকিয়েছে। এসেন্স মেখেছ নাকি। ভারী সুন্দর গন্ধ তো।'।

"হ্যাঁ, আমার মামাতো বোন টুকু দিয়েছিল একটা 'ইভনিং ইন প্যারিস'।"

"ও।"

দাম জিজ্ঞাসা করিবার সাহস হইল না। তবে সভয়ে লক্ষ্য করিলাম অলঙ্কারে কাপড়ে তিনি যাহা পরিধান করিয়া আছেন, তাহা কিনিয়া দিতে হইলে আমার দম ফুরাইয়া যাইত। জানাশোনা শস্তা দোকানে গেলেও নাভিশ্বাস অনিবার্য হইত। সুতরাং ঠিক করিলাম কাঁচা নগদ পয়সা এখন, উহার হাতে দিব না। আগে কিছুদিন লক্ষ্য করিয়া দেখি। গোবর্ধনের আমলে যেমন নিজেই সব জিনিস কিনিয়া দিতাম, তেমনই দিতে লাগিলাম। গোবর্ধনের বিষয়েও তাহাকে বিশেষ করিয়া সাবধান করিয়া দিলাম।

বলিলাম, "খুব কড়া নজর রাখবে ওর উপর। বাজার থেকে যা জিনিসপত্র আসবে তা ওজন করে গুণে নেবে, এমন কি আলু, পটল পর্যন্ত। ভাঁড়ার ঘরের চাবি যেখানে সেখানে ফেলে রেখ না। দেশলাইটি খুব সাবধানে রাখবে। তা' নাহলে একদিনেই ফাঁক করে' দেবে। রোজ এক বাণ্ডিল করে' বিড়ি ফোঁকে। খুব কড়া নজর রেখ—"

মধুর হাসি হাসিয়া মনোমোহিনী বলিল, "রাখব—"।

গালে টোল পড়িল। হাসিটি সত্যই বড় সুন্দর। ওই হাসিই আমাকে শেষ পর্যন্ত ডুবাইল।

একদিন কি খেয়াল হইল গোপনে দেশলাইয়ের কাঠিগুলি গণিয়া দেখিলাম। ইতিপূর্বেও গোবর্ধনকে 'চেক' করিবার জন্য মাঝে মাঝে গণিয়া দেখিতাম। দেখিলাম যত খরচ হওয়া উচিত ছিল, তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী খরচ হইয়াছে। এক আধটি নয়, দশটি কাঠি অন্তর্ধান করিয়াছে। বুঝিলাম মনু গোবর্ধনকে আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছে না। ভয়ানক রাগ হইল। কিন্তু মনুর আত্মসম্মানে পাছে আঘাত লাগে, এই ভয়ে ইহা লইয়া আর হৈ-চৈ করিলাম না।

ইহার দিন দুই পরে হঠাৎ একদিন বেলা দেড়টার সময় বাসায় ফিরিতে হইল। সাধারণতঃ আমি পাঁচটার আগে ফিরি না। ঢুকিয়াই দেখি গোবর্ধন মনের আনন্দে বিড়ি ফুঁকিতেছে—। আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিলাম

না, সেদিনকার অবরুদ্ধ ক্রোধ বোমার মতো ফাটিয়া পড়িল। গোবর্ধনের গালে ঠাস করিয়া একটা চড় বসাইয়া দিলাম।

গোবর্ধন মহাপুরুষ। বিন্দুমাত্র বিচলিত হইল না। বিড়িটিতে শেষ টান মারিয়া সেটা জানালা দিয়া ফেলিয়া দিল। তাহার পর হেঁট হইয়া আমার জুতার ফিতা খুলিতে লাগিল। জুতা দুইটি খুলিয়া লইয়া স-সম্ভ্রমে বলিল, "বৌমা এই সবে শুয়েছেন, একটু পা টিপে টিপে ওপরে যাবেন বাবু—"

"পা টিপে টিপে? তার মানে—"

"আমাকে তাই তো হুকুম দিয়েছেন, বলেছেন, দেখো সিঁড়িতে যেন কোনও শব্দ না হয়—"

পা টিপিয়া টিপিয়া সন্তর্পণে উপরে উঠিলাম। উঠিয়া যাহা দেখিলাম তাহা, মানে—অচিন্তনীয়—! মন্থু নিবিষ্টচিত্তে বই পড়িতেছে, বাঁ হাতে জ্বলন্ত সিগারেট, নাক দিয়া ধোঁয়া বাহির হইতেছে! আমাকে দেখিয়া মুচকি হাসিল। গালে টোল পড়িল। বইটি দেখিলাম একটি ইকনমিক্‌স্ বিষয়ক বই।

দ্বিতীয়বার বোতাম টিপিবার পর কপাট খুলিল। বিজন ডাক্তার চোখ কচলাইতে কচলাইতে নামিয়া আসিয়া সবিস্ময়ে বলিল - "কে মহীতোষ? কি ব্যাপার, এত রাত্রে"।

"একবার গলাটা দেখতো ভাই, বড্ড কষ্ট পাচ্ছি—"

গলা দেখিয়া বিজন মন্তব্য করিল, "সিগারেট ধরেছ নাকি—"

"ধরেছি সম্প্রতি"।

"তাই না কি! সেই জন্যেই হয়েছে—"

বিজন একটা প্রেস্‌ক্রিপশন লিখিয়া আমার হাতে দিল। আমি ফিরাইয়া দিয়া বলিলাম—"ফর মহীতোষ না লিখে, লিখে দাও ফর বাল্মীকি—"

দুইটি ছবি

১

মিস্টার মাজিয়ার আমন্ত্রণে তাঁহার কলিকাতার বাসায় সন্ধ্যাবেলা গিয়াছিলাম। দেখিলাম ভদ্রলোক আহারাদির প্রচুর আয়োজন করিয়াছেন। দেশী-বিদেশী বহুবিধ খাদ্য-পানীয়ের ব্যবস্থা দেখিয়া মনে মনে প্রমাদ গণিলাম। আমি স্বল্পাহারী লোক, সেই বিপুল আয়োজনের মর্যাদা রক্ষা করিবার সামর্থ্য আমার ছিল না। বলিলাম, "রাত্রে আমি কিছু খাই না। নিতান্তই যদি দুঃখিত হন সামান্য কিছু খাইব।" কিন্তু অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান-কুলোদ্ভবা মিসেস মাজিয়ার আন্তরিক আগ্রহ, অসামান্য রূপ, চটুল চাহনি এবং সুমিষ্ট হাসির তোড়ে আমার এ মনোভাব বেশীক্ষণ স্থায়ী হইতে পারিল না। তিনি বলিলেন, "আপনার জন্যই এত সব আয়োজন। দ্বিতীয় কোনও লোককে আমরা নিমন্ত্রণ করি নাই। আপনি না খাইলে কি চলে! আপনি যা পারেন, যতটা পারেন খান। না, আমি কোনও কথা শুনিব না। আসুন—"

মাথা ঝাঁকাইয়া চোখে-মুখে হাসিমাখা অভিমানের ঝিলিক তুলিয়া তিনি আমার হাত ধরিয়া একেবারে খাইবার টেবিলে লইয়া গেলেন।

মিস্টার মাজিয়া গম্ভীর প্রকৃতির লোক। তিনি একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আপনি আমাদের যে ঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন, লুসির বিশ্বাস আপনাকে খাওয়াইয়া সে-ঋণ হইতে অন্তত খানিকটা সে মুক্ত হইবে। আমার বিশ্বাস কিন্তু অন্যরূপ। আমি ভারতবর্ষের আদিবাসী তো—"

আমাদের কথাবার্তা ইংরেজীতেই হইতেছিল। মিস্টার মাজিয়ার সহিত আমার সম্পর্ক রোগী-ডাক্তারের সম্পর্ক। মিস্টার মাজিয়া অথবা লুসি কাহার পা প্রথমে হড়কাইয়াছিল তাহা জানি না। আমার নিকট তাঁহারা যখন আসিয়াছিলেন তখন দেখিয়াছিলাম উভয়েরই গনোরিয়া হইয়াছে। যথারীতি

চিকিৎসার পর এখন তাঁহারা অনেকটা সুস্থ হইয়াছেন। লুসি একটি সুস্থ শিশু প্রসব করিয়াছেন কয়েক মাস পূর্বে।

আহারাদির কায়দা সম্পূর্ণ বিলাতী। কোর্সের পর কোর্স আসিতেছে, প্লেটের পর প্লেট বদল হইতেছে, নিঃশব্দ পদসঞ্চারে ধোপদস্ত পোষাক-পরা খানসামারা যাতায়াত করিতেছে। লুসি হাসিয়া হাসিয়া কখনও একটু 'সস্' কখনও একটু 'রাই' আগাইয়া দিতেছেন। পাশের ঘরে রেডিওতে একটা বিলাতী নাচের বাজনা বাজিতেছে।

"আপনি আদিবাসী না কি ?"

মিস্টার মাজিয়া বলিলেন, "হাঁ সাহেবগঞ্জের পাহাড়ের উপর আমাদের বাড়ি ছিল।"

"ও, সাহেবগঞ্জ ?"

"হাঁ। আমার বাবার মৃত্যুর পর আমাদের বড় দুরবস্থা হইয়াছিল। একজন সহৃদয় মিশনারি সাহেব আসিয়া আমাদের খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা দেন। তাঁহারই অনুগ্রহে আমি লেখাপড়া শিখি। তিনিই আমাকে এই চাকরি জুটাইয়া দিয়াছেন।"

"ও। আপনাব বাবা কি করিতেন ?"

"চাষ-বাস। বাবা খুব পপুলার লোক ছিলেন। মুলুক মাঝিকে এখনও পাহাড়ী সাঁওতালরা মনে করিয়া রাখিয়াছে।"

"মুলুক মাঝি আপনার বাবার নাম ?"

"হাঁ—। মাঝি-উপাধিকেই আমি 'মাজিয়া' করিয়াছি।"

২

সাহেবগঞ্জ পাহাড়ের উপরে একটি দশ বৎসরের বালক অসহায়ভাবে একটি পাথরের উপর বসিয়া এদিক-ওদিক চাহিতেছিল। বেচারা পথ হারাইয়া ফেলিয়াছিল। যখন পাহাড়ের সঙ্কীর্ণ আঁকাবাঁকা পথ বাহিয়া সে উপরে উঠিতেছিল তখন খেয়াল ছিল না যে, একটু পরেই সূর্য অস্ত যাইবে, অন্ধকারে

পথ খুঁজিয়া পাওয়া শক্ত হইবে। বালকটি স্থানীয় স্কুলের ছাত্র, বোর্ডিং-এ থাকে। তাহার আশঙ্কা হইতেছিল দেরিতে বোর্ডিংয়ে ফিরিলে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মহাশয় না জানি কি করিবেন। বড় কড়া লোক। তা ছাড়া আর একটা জনশ্রুতিও সে শুনিয়াছিল। পাহাড়ে নাকি বড় বড় বাঘ আছে, রাত্রিকালে তাহারা বাহির হয়। বালক আর একবার উঠিয়া পথ খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু বৃথা। যেদিকে পা বাড়ায় সেদিকেই হড়কাইয়া যায়। কয়েকবার বৃথা চেষ্টা করিয়া সে পুনরায় গিয়া পাথরটির উপর বসিল। সহসা তাহার নজরে পড়িল, একটি কালো মূর্তি নীচে হইতে উপরের দিকে উঠিতেছে। সাহস সংগ্রহ করিয়া সে ডাক দিল—"কে—"

"আমি মুলুক মাঝি। তু কে বটিস্?"

"আমি স্কুলের ছেলে একজন। রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি -"

"দাঁড়া আসি।"

মুলুক মাঝি মিনিট পাঁচেকের মধ্যে আসিয়া হাজির হইল। সব শুনিয়া বলিল, "তু আজ আমাদের গাঁয়ে চল। কাল ভোরে তুকে নামাই দিব।"

"আমাকে মাস্টাররা বকে যদি—"

"বকবে কেনে? আমি মুলুক মাঝি তোকে সঙ্গে নিয়ে যাব, বকবে না। তোর হেড মাস্টার আমাকে খুব মানে।"

গত্যন্তর ছিল না। মুলুক মাঝির সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিলাম।

"তু খোঁড়াছিস্ কেন রে।"

"ডান পাটা পাথরে কেটে গেছে।"

মুলুক মাঝি বসিয়া পড়িল।

"আমার পিঠে চড়। …"

বালকটির প্রথমে লজ্জা করিতেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চড়িতেই হইল।

কিছুক্ষণ পরে মুলুক মাঝি তাহাকে লইয়া যখন নিজেদের গ্রামে প্রবেশ করিল তখন আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে।

উঠানের মাঝখানে বালককে বসাইয়া মুলুক হাঁক দিল—"ও মেঝেন, দেখ কে এসেছে—"

দল বাঁধিয়া সকলে আমাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। বিস্ময়ে অবাক হইয়া রহিল খানিকক্ষণ, আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল তাহার পর।

"ওকে খেতে দে আগে।"

ঘরে গাই ছিল। সে দিল এক ঘটি সফেন দুগ্ধ। মেঝেন বাহির করিল চিঁড়া আর গুড়। আহারাদির পর শুরু হইল নাচ-গান, মাদল আর বাঁশি জ্যোৎস্নাকে আকুল করিয়া তুলিল।

চল্লিশ বৎসরের যবনিকা সরিয়া গিয়াছে। মুগ্ধ নেত্রে সেই দৃশ্য আবার প্রত্যক্ষ করিতেছি। আমার মধ্যে সে বালক কি এখনও প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে? মিস্টার মাজিযার দৃষ্টির ভিতর দিয়া মুলুক মাঝি কি আমাকে আবার দেখিতেছে? সব কেমন যেন গোলমাল হইয়া গেল। পাশের ঘরে রেডিওতে বাজনাটা উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে।

"আপনি কি ভাবিতেছেন বলুন তো। কিছুই তো খেলেন না—'

লুসির কথায় চমক ভাঙিল। তাহার হাসিমাখা চোখ দেখিয়া মনে পড়িল ঝুমরীকে। কিশোরী একটি। মুলুক মাঝির উঠানেই সেদিন সে ছিল। আর আমাকে বারবার অনুরোধ করিতেছিল আর একটু খাওয়ার জন্য।

"ডাক্তার, আপনি কি ভাবিতেছেন বলুন তো" মিস্টার মাজিযা প্রশ্ন করিলেন।

"কিছুই না। নাথিং—"

উঠিয়া পড়িলাম।

অজ-প্রসঙ্গ

বেসে জিতে ননীগোপাল খাইয়েছিল প্রচুর।

কোলকাতা থেকে বিসড়া গিয়ে আবার রাত্রের ট্রেনে ফিরে আসা খুবই ঝামেলার ব্যাপার। কিন্তু ননী না-ছোড়, যেতেই হলো। বিনয়, সুরেশ আর আমি, তিনজনেই গেলাম। না গেলে ঠক্‌তুম। পাকা মাছ, মুর্গ মসল্লম্‌ আর পাঁঠার মাংসের মোগলাই কারির সঙ্গে ছিল বিরিয়ানি পোলাও—শাক চচ্চড়ি এসব বাজে ভেজাল ছিল না। আর একটি অসাধারণ তরকারি খাইয়েছিল ননী সেদিন। অপূর্ব্ব লেগেছিল। বুঝতেই পারিনি কি খাচ্ছি। প্রথমে মনে হয়েছিল বুঝি মেটে চচ্চড়ি, কিন্তু দু' এক টুকরো চিবিয়েই বুঝেছিলাম মেটে চচ্চড়ি নয়, অন্য কিছু। এত ভাল লাগল যে দু'বার চেয়ে নিলাম। খেয়ে উঠে ননীগোপালের কাছে শুনলাম ওটা জিব-কাবাব। অর্থাৎ পাঁঠার জিব কুঁচিয়ে কাবাব করা হয়েছে। আসল মালটি। কিন্তু সেদিন দর্শন পেয়েছিলাম সর্ব্ব শেষে। ট্রেনে। খাবার নয়, মানুষ।

খাদ্য প্রসঙ্গ আলোচনা করতে করতেই আমরা ষ্টেশনে এলাম। সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনও এল। খালি ভেবে যে কামরাটিতে উঠলাম সেটি একেবারে খালি ছিল না। কোণের দিকে একটি ভদ্রলোক বসে ছিলেন। তাঁর দিকে একবার চেয়েই পিতৃনাম উচ্চারণ করতে হল। মনে হল আমরা যদি আদা হই উনি কাঁচকলা। নাকের ওপর রস-কলি, মাথায় স-ফুল টিকি, গায়ে নামাবলী, পরিধানে পট্টবস্ত্র, হাতে জয়-দেব, পায়ে বিদ্যাসাগরী চটি। দেখবামাত্র কেমন যেন আক্রোশ হ'ল লোকটার উপর। পরের পয়সায় মাছ মুরগী পাঁঠা পোলাও গিলে কোথায় বেশ স্ফূর্ত্তি করতে করতে যাব, তা না কোথা থেকে এক আপদ এসে জুটল। এই মূর্ত্তিমান

বেবসিকেব সামনে কথনও মুখ খোলা যায়। ঠিক কবলাম জ্বালাতে হবে ব্যাটাকে। মানে, বাক্য দিয়ে যতটা সম্ভব।

তিনজনেব মধ্যে চোখাচোখি হয়ে গেল। তিনজনেবই মনেব ভাব এক।

সবিনয়ে নমস্কাব কবে আমিই প্রশ্ন কবলাম, 'ভটচাজ্‌মশায়ের কতদূব যাওয়া হবে—'

প্রতিনমস্কাব কবে শান্ত কণ্ঠে তিনি উত্তব দিলেন 'উত্তব পাডা'

হঠাৎ সুবেশ বিনয়কে ধাক্কা মেবে বললে, 'একটু সবে বস, মাইবি। মুখে তোব এখনও পেঁয়াজেব গন্ধ ছাডছে।' বিনয় উঠে ভট্টাচার্য্যেব পাশে গিয়ে বসল। ভট্টাচার্য্য নির্ব্বিকাব। ফিবে চেয়েও দেখলেন না।'

আমি তখন ফুট কাটলাম আবাব, 'পাঁঠাব জিব-কাবাবটা বেডে হয়েছিল মাইবি। কাঁচা পেঁয়াজেব বস দিয়েছিল নিশ্চয় নামাবাব আগে, তাই বিনটাব মুখে গন্ধ ছাডছে। মুখ ধুসনি নাকি ভাল কবে?

বিনযটা হাসতে লাগল ফ্যাক্‌ ফ্যাক্‌ কবে। ভটচাজেব দিকে আডচোখে চেয়ে দেখলাম আবাব। কোনও ভাবান্তব লক্ষ্য কবলাম না।

সুবেশ দিনকতক কোন এক মেডিকেল স্কুলে পডেছিল নাকি, তাই সুযোগ পেলেই ডাক্তাবি বুক্‌নি ছাডে।

সে বললে, 'আমবা পাঁঠাব ডাইজেস্‌টিভ ক্যানালটা [illegible] মতো বাদ দি। কিন্তু বাঁধতে পাবলে ওব তুল্য জিনিস নেই। যাদেব আমবা ছোটলোক বলি তাবা আমাদেব চেয়ে ঢেব বেশি বুদ্ধিমান। তাই তাবা সস্তায় নাডিভুঁডিগুলো কিনে নিয়ে যায়। ঝুনাকিব বাডিতে এসে ভুঁডি চচ্চডি খেয়েছিলাম একবাব মাইবি। মদেব ওবকম চাট আব হয় না।'

বিনয় বললে, 'ছোটলোক কেন, পুরুলিয়াতে ভদ্রলোকেবাও নাডিভুঁডি খায়। নাডিগুলো প্রথমে ধুয়ে পবিষ্কাব কবে, তাবপব সেগুলো দিয়ে পাঁজবাব হাডে ফাঁস লাগিয়ে লাগিয়ে হাড-জোডা তৈবী কবে তাবা তাবপব সেগুলো মাংসেব সঙ্গে বান্না কবে। দিব্যি খেতে। খাসনি কখনও?'

আমি বললাম, 'হাড়-জোড়া খাইনি, কিন্তু কামা-পাঁঠা খেয়েছি'

'সে আবার কি রে'

'এও মানভূমে হয়। পাঁঠাটাকে জবাই বা বলিদান করবার পর একটা নাপিত এসে গোটা পাঁঠাটাকে পরিষ্কার করে কামিয়ে দেয়। ক্লীন শেভড্, গায়ে একটি লোম থাকবে না। তারপর গোটা পাঁঠাটাকে ভাল করে' ধুয়ে চামড়া সুদ্ধ টুকরো করতে হয়। মানে, চামড়াটা ওরা নষ্ট করে না। ওরা বলে চামড়া ছাড়িয়ে নিলে চামড়ার নীচে যে চর্ব্বি থাকে সেটা নষ্ট হয়ে যায়। অনেকে মুরগীরও চামড়া ছাড়ায় না। কামা-পাঁঠার মোগলাই কারি যা খেয়েছি তা দুর্দ্দান্ত—'

আবার আড়চোখে চাইলাম ভট্চাজের দিকে। আমাদের কথা যে তার কানে ঢুকছে তা মনেই হল না। নিবিষ্টচিত্তে পড়ে' চলেছেন।

সুশীল হঠবার পাত্র নয়।

সে বলে চলল—'কামা-পাঁঠা খাইনি অবশ্য কিন্তু পোঁতা-পাঁঠা খেয়েছি'

'কি রকম। পাঁঠা পুঁতে পচিয়ে?'

'আরে না, না, টাটকা। শোন তবে। ধানবাদে কতকগুলি আমুদে কাবুলীওলার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল আমার একবার। তারা একদিন নিমন্ত্রণ করেছিল আমাকে। যখন গেলাম তখন রাত আটটা হবে। কিন্তু গিয়ে দেখি খাসি তখনও ব্যা ব্যা করছে, একটু দূরে এক বলিষ্ঠ কাবুলী কোদাল চালিয়ে গর্ত্ত খুঁড়ছে একটা। জিগ্যেস করলাম ব্যাপার কি। কাবুলী বন্ধু হেসে জবাব দিলে, বাংগালী বাবু, শবর্ শবর্। অর্থাৎ বাঙালীবাবু, সবুর করুন। একটু দূরে একটা জ্বলন্ত কয়লার স্তূপ গন্‌গন্ করছিল। গর্ত্তটি যখন বেশ গভীর হল—মানে হাঁটু ভর, তখন একটি কাবুলী কোদাল নিয়ে টেনে টেনে সেই গনগনে কয়লাগুলোকে গর্ত্তে এনে ফেলতে লাগল। গর্ত্তটি ভরে গেল একেবারে। তারপর জবাই করা হলো খাসিটাকে। চামড়াটি ভাল করে ছাড়িয়ে আলদা রেখে দিলে। তারপর আমরা যেমন মাংস কাটি তেমনি করে' কাটলে, তবে টুকরোগুলো বেশ বড় বড়। আমরা যেমন

মশলাটশলা মাখাই কসবার আগে, ঠিক তেমনি মশলাও মাখালে, কিন্তু কসলে না। সমস্ত মাংসটা পুরে ফেললে সেই চামড়ার ভিতর। পুরে সেলাই করে দিলে গুণ ছুঁচ দিয়ে। একটা বড় পুঁটুলির মতো হল। তারপর সেই গর্ত্তের ভিতর থেকে জ্বলন্ত কয়লাগুলো বার ক'রে ফেলে' পুঁটুলিটা ঢুকিয়ে দিলে তার ভিতরে। তার ওপব মাটি দিলে, মাটির উপর আবার সেই জ্বলন্ত কয়লাগুলো দিলে চাপিয়ে। বিনয় হেসে বললে, ছেলেবেলায় ঠাকুমার কাছে গল্প শুনেছিলাম কোন এক রাণীকে নাকি হেঁটে-কাঁটা, উপরে-কাঁটা দিয়ে পোঁতা হয়েছিল, এ যে অনেকটা সেই রকম দেখছি।'

সুশীল চটে উঠল।

'কি রকম বেরসিক রে তুই! রাণীর সঙ্গে পাঁঠাব উপমা দিচ্ছিস—'

বিনয় চটে কি একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিল আমি থামিযে দিলাম।

'গল্পটা আগে শেষ কর। তারপব উপমা নিযে ঝগড়া কবিস। তাবপর কি হল বল—'

'তাবপর কাবুলীরা সেই গর্ত্ত ঘিরে বসে নাচ-গান শুরু করে' দিলে। দু' ঘণ্টা নাচ-গান চলল।

কাবুলী নাচ দেখেছিস কখনও? তাণ্ডব তাব কাছে ছেলে মানুষ-

'আবার বাজে বকছিস তুই। মাংসটা কেমন হয়েছিল তাই বল না'

'অমৃত'

ভট্টাচার্য্যের দিকে এক নজর চেয়ে আমি বললাম, 'এমন অশাস্ত্রীয় ভাবে মাংস খাওয়া কি উচিত? আপনিই বলুন তো ভট্চাজ মশায়'

ভট্টাচার্য্য বই থেকে চোখ তুলে আমার মুখের দিকে স্মিতমুখে চেয়ে রইলেন, কোনও উত্তর দিলেন না।

আমি পুনরায় প্রশ্ন করলাম, 'আচ্ছা, পাঁঠার কোন কোন অংশ খাওয়া

উচিত, কোন অংশ বাদ দেওয়া উচিত বলুন তো। আপনার মত একজন বিজ্ঞ লোককে কাছে যখন পেয়েছি জেনেই নি ব্যাপারটা!'

ট্রেন এসে উত্তরপাড়ায় থামল।

ভট্টাচার্য্য আরও কিছুক্ষণ স্মিতমুখে চেয়ে থেকে উত্তর দিলেন, 'দড়ি গাছটা ছাড়া আর কিছুই তো ফেলবার নেই'

বলেই উঠে পড়লেন এবং নেবে গেলেন ট্রেন থেকে।

চঞ্চলা

অনিমেষ ঘোষাল নির্নিমেষ নয়নে পুরাতন প্রকাণ্ড বাড়িটার দিকে চাহিয়াছিল। যে স্থানে সে দাঁড়াইয়া ছিল, তাহা চঞ্চলাদের বাড়ির সীমানার বাহিরে একটা উঁচু টিলার উপর। ওই স্থানে দাঁড়াইলে ত্রিতলের একটা বাতায়ন দেখা যায়। সেই বাতায়নপথে চঞ্চলাকে সে মাঝে মাঝে দেখিয়াছে। সেই আশাতেই সে আসিয়াছিল। পাত্র-হিসাবে অনিমেষ ঘোষাল মন্দ নয়। এম এ পাস, ভাল কলেজে চাকুরি পাইয়াছে, পিতামাতা ভাইভগ্নীর ঝামেলা নাই, বলিষ্ঠ দেহ। তথাপি কিন্তু চঞ্চলার পিতা শক্তিধরবাবু তাহার বিবাহের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছেন। চঞ্চলাও করিয়াছে। একজন সামান্য প্রফেসারের ঘরণী হইয়া সারাজীবন কৃচ্ছ্রসাধনের বাসনা তাহার নাই। সে রূপসী, সে ধনীর দুলালী, জীবন-সাগরের তরঙ্গশীর্ষে ময়ূরপঙ্খীর মত সে ভাসিয়া বেড়াইবে, একটা অধ্যাপকের ঘরণী হইতে যাইবে কেন! অনিমেষ তাহাকে ভালবাসে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার বিনিময়েই জীবনের সমস্ত সুখ স্বাচ্ছন্দ্য আশা-আকাঙ্ক্ষা কি বলিদান দেওয়া যায়?

অনিমেষ চঞ্চলাকে একটী কথা শুধু জানাইয়া দিতে আসিয়াছিল। বলিতে আসিয়াছিল, চঞ্চলা যাহাকে খুশি বিবাহ করুক, তাহার কথা সে যেন স্মরণে রাখে, বিবাহ নামক দুর্নিবার ঘটনাটা যেন তাহাদের মধ্যে কারা-প্রাচীরের দুর্লঙ্ঘ্যতা সৃজন না করে। অনিমেষের দ্বারা চঞ্চলার কখনও যদি কোনও উপকার হয় তাহা করিতে অনিমেষ সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিবে। এই সব কথাই সে বলিতে আসিয়াছিল, কিন্তু বলিবার সুযোগ পাইল না। দারোয়ান তাহাকে দেখা করিতে দিল না, বলিল, দিদিমণির শরীর ভাল নেই, কাহারও সহিত তিনি দেখা করিবেন না। অথচ অনিমেষ খবর পাইয়াছে, আজই বৈকালে অর্থাৎ আর একটু পরেই

চঞ্চলাদের বৈঠকখানায় নবাগত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটটি আসিবেন এবং সম্ভবত আজই তাঁহার সহিত চঞ্চলার বিবাহের কথাবার্তা পাকা হইয়া যাইবে।

অনিমেষ নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিল। বাতায়নপথে একবার যেন চঞ্চলাকে দেখা গেল। একটি সুসজ্জিতা প্রতিমা যেন স্বপ্ন-প্রাসাদের বাতায়নে দেখা দিয়াই বাস্তবের রূঢ়তায় বিলীন হইল। পুরাতন ত্রিতল বাড়িটার দিকে চাহিয়া অনিমেষের অধরে মৃদু একটি হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল। চঞ্চলা কিছুদিন পূর্বে কমিউনিজম লইয়া খুব মাতিয়াছিল। সহসা সে ঠিক করিয়া ফেলিল, অপেক্ষা করিবে। এই মাঠেই অপেক্ষা করিবে। চঞ্চলাকে শেষ কথাটা বলিয়া না গেলে সে শান্তি পাইবে না। আর আজ না বলিলে হয়তো বলাই হইবে না। সহসা তাহার নজরে পড়িল, অপরাহ্ণের আকাশে মহোৎসব পড়িয়া গিয়াছে, কত বিভিন্ন বর্ণের মেঘমালা কত বিভিন্ন ভঙ্গীতেই না একত্রিত হইয়াছে! নীরবে বহুবর্ণের ঐকতান বাজিতেছে যেন! তাহার সমস্ত চিত্তও ধীরে ধীরে বর্ণাপ্লুত হইয়া গেল। ধীরে ধীরে সে সেই টিলার উপরে বসিয়া পড়িল। যে স্বপ্ন তাহার সমস্ত চিত্তকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল আকাশে তাহার প্রতিচ্ছবি দেখিয়া সে মুগ্ধ হইয়া গেল।

২

চঞ্চলাও মর্ত্যলোকে ছিল না। এক অপূর্ব আবেশে তাহার সমস্ত শরীর বিহ্বল হইয়া গিয়াছিল। একটা সেতারে কে যেন সুর বাঁধিয়া রাখিয়াছে। অঙ্গুলিস্পর্শে কোনও রাগিণী এখনও বাজিয়া উঠে নাই, কিন্তু সেতারের প্রতিটি তার যেন তাহার জন্য উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে।

মনে হইতেছিল, আজ তাহাকে এমন একটা বিশেষ ভূমিকায় অভিনয় করিতে হইবে যাহা যুগান্তকারী! আজিকার নির্মল নীল আকাশ, সুরভিত মন্দ সমীরণ, বিহঙ্গকুলের বিচিত্র কাকলী যে রঙ্গমঞ্চের পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছে, সে রঙ্গমঞ্চে চঞ্চলাই যেন আজ প্রধান অভিনেত্রী, পটোত্তোলনের অপেক্ষায় আশা-আকাঙ্ক্ষা-আন্দোলিত চিত্তে অপেক্ষা করিতেছে। অনিমেষের কথা

একবার তাহার মনে হইল। এই যুগান্তকারী নাটকে তাহার কি কোন ভূমিকা আছে? মনে হইল, নাই। থাকিতে পারে না। সে নিজেই থাকিতে দেয় নাই।

…তিনতলায় নিজের ঘরটিতে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল সে। দূরে নদী বহিয়া গিয়াছে। শীতের নদী—স্বল্প-তোয়া, কিন্তু সুন্দর। স্বচ্ছ জলের ধারা জ্যোতির রেখার মতো আঁকিয়া বাঁকিয়া দিগন্তসীমার ওপারে কোথায় চলিয়া গিয়াছে?…সবিস্ময়ে চঞ্চলা ভাবিতে লাগিল। নদী কোথায় শেষ হইয়াছে, ভৌগোলিক তাহা হয়তো বলিতে পারিবেন, কিন্তু ওই জ্যোতির রেখাটা? যখনই তেতলার এই জানালাটার ধারে সে আসিয়া দাঁড়ায়, তখনই তাহার এ কথাটা মনে হয়। সেদিনও তাহার মনে হইতেছিল চারিদিকে এই যে জীবনের বিচিত্র প্রকাশ, এ কিসের উৎসব। দৃষ্টির বাহিরে, যুক্তিরও বাহিরে কি যেন একটা ঘটিতেছে যাহা দেখা যায় না, ধরা যায় না, কিন্তু বোঝা যায়; যাহা কেবল অনুভূতির পরদায় সূক্ষ্ম শিহরণ তুলিয়া সমস্ত চিত্তকে আকুল করিয়া দেয়। সেই অন্তরালবর্ত্তিনীর অবগুণ্ঠিতসত্তাই যেন জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষ্যে রূপে রসে রঙে নানা ছন্দে নিজেকে প্রকাশ করিতেছে। পুষ্পের বিকাশে, ঝঞ্ঝার তাণ্ডবে, অরণ্যের জটিলতায়, অঙ্কুরের উদ্গমে, প্রণয়ীর আলিঙ্গনে, ক্ষুধিতের আগ্রহে, বর্ষার মুষলধারায়, শরতের স্নিগ্ধতায়, দুর্ভিক্ষের করাল ছায়ায়, মৃত্যুর অন্ধকারে, জীবনের স্পন্দনে, প্রকৃতির লক্ষ ভঙ্গিমার বৈচিত্র্যলীলায় অহরহ উৎসারিত হইয়া উঠিতেছে, এ কে! চঞ্চলা মাঝে মাঝে কবিতা লেখে, এই লীলাময়ী প্রকৃতি সত্যই তাহাকে মাঝে মাঝে উতলা করিয়া তোলে। তখন তাহার মনে হয়, তাহার মধ্যেও এই লীলাময়ী গোপনে গোপনে কিসের যেন ষড়যন্ত্র করিতেছে, সহসা একদিন সে সচকিত হইয়া এক অভিনব মায়ালোকে জাগিয়া উঠিবে। অদৃশ্য রঙ্গমঞ্চ তখন আর দৃষ্টির অন্তরালে থাকিবে না। অপরিচিত অসংখ্য জনতার উৎসুক দৃষ্টিকে মুগ্ধ করিয়া তাহাকে একদা স্বকীয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতে হইবে। কিন্তু কিসের সে ভূমিকা? কি সে

হইতে চায়? জীবনে তাহার আকাঙ্ক্ষা কি? সে কলেজের যে কোন হুজুগে মাতিয়া হাসিতে গানে উৎসাহে উল্লাসে সকলকে মুগ্ধ করিয়া দিতে চায়। বিকাশদাদার বক্তৃতা শুনিয়া, শ্রমিক মজুরদের দুঃখে বিগলিত-চিত্ত হইয়া তাহাদের জন্য আত্মবিসর্জন করিতে চায়, প্রফেসার অনিমেষ ঘোষালের ইতিহাসের গবেষণা দেখিয়া ঐতিহাসিক-অনুসন্ধানে জীবন উৎসর্গ করিতে চায়, আবার কবি শ্বেতকমলের কবিতা শুনিয়া কাব্যলোকের স্বপ্ন-কুহেলীতে পথ হারাইয়া ফেলিতে চায়। সে সব চায়। গান্ধীজির আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া চরকা ধরে আবার রবীন্দ্রনাথের সিল্কের জোব্বা দেখিয়া খদ্দরের সম্বন্ধে বীতরাগ হয়, তাহার গভর্নেস্ মিস গ্রীনের মৌন মহিমা তাহাকে মুগ্ধ করে আবার সরোজিনী নাইডুর প্রেরণায় সে বক্তৃতা দিতেও উদ্বুদ্ধ হয়। গরীব শ্রমিকদের দুঃখ সত্যই তাহার চিত্তকে বিগলিত করে, কিন্তু ধনী পিতার অগাধ ঐশ্বর্যকে সে তুচ্ছ করিতে পারে না।

··সহসা ঘাড় ফিরাইয়া সে চাহিয়া দেখিল, বিরাট দর্পণে তাহার সমস্ত দেহটা প্রতিফলিত হইয়াছে। বাতায়নটাও প্রতিফলিত হইয়াছে, আকাশেরও খানিকটা। সে কিন্তু নিজের প্রতিবিম্বের দিকেই মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। নূতন ঢাকাই শাড়িখানায় তাহাকে চমৎকার মানাইয়াছে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল চূড়ামণিবাবুকে। তিনিই তাহাকে জন্মদিনে শাড়িখানা উপহার দিয়াছিলেন। চমৎকার লোক এই চূড়ামণি চৌধুরী। যেমন বিদ্বান, তেমনি রূপ। এখানে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হইয়া আসিয়াছেন। বাবার বাল্যবন্ধুর একমাত্র ছেলে। সে-ও তো বাবার একমাত্র মেয়ে। একটা স-মিল ছন্দ যেন ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে। চঞ্চলার কর্ণের অগ্রভাগে রক্তিমা দেখা দিল। উষ্ণ রক্তস্রোত ধীরে ধীরে সমস্ত মুখে সঞ্চারিত হইয়া সর্বাঙ্গে প্রসারিত হইয়া গেল। কিন্তু না, না, সহসা আবার মনে হইল, কি না! নির্বাক হইয়া নিজের প্রতিবিম্বের দিকে চাহিয়া রহিল সে। চোখের দৃষ্টিতে, উন্মুখ অধরে, উজ্জ্বল গৌরবর্ণের রক্তিমায় যাহা সূচিত হইতেছে তাহা তো প্রত্যাখ্যান নয়, আবাহন। তাহার অন্তরের গোপনতম

বাসনাই কি তবে এই ? জ্ঞাতসারে এতদিন সে যাহা ভাবিয়া আসিয়াছে তাহা অন্য রকম, তাহা আদর্শ জীবনের কথা। সে লেখাপড়া করিবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষস্থান অলঙ্কৃত করিবে, দেশের কাজ করিবে, দরিদ্রের দুঃখ মোচন করিবে, মঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া প্রাণস্পর্শী বক্তৃতায় অসংখ্য শ্রোতার প্রাণমন উদ্বুদ্ধ করিবে। এই তো তাহার অন্তরের কথা। দর্পণের প্রতিবিম্বিত মূর্তিতে তাহার সর্বাঙ্গ দিয়া আজ এ কোন্ নূতন কথার আভা বিচ্ছুরিত হইতেছে ? সে সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল। অনিমেষের কথা মনে পড়িল আর একবার। তাহাকে প্রত্যাখ্যান না করিলে হয়তো···। সহসা মৃদু সমীরণ-স্পর্শে সে শিহরিয়া উঠিল। বাতায়ন-পথে চাহিয়া দেখিল, নির্মল নীল আকাশ, দিগন্তে অপসৃয়মান জ্যোতির রেখা, বাগানে অসংখ্য ফুলের অসংখ্য ভঙ্গিমা, সকলেই যেন তাহার দিকে তাকাইয়া আছে। তাহার সহিত চোখাচোখি হইবামাত্র সকলেই যেন সমস্বরে বলিয়া উঠিল—আমরা তো প্রস্তুত আছি, তুমি এস একবার।··সকলেরই আহ্বান সে শুনিতে পাইল, কিন্তু যাহা অমোঘ, যাহা সত্যের নিকটে যাচাই করিয়া তাহার প্রকৃত মূল্য নিরূপণ করিবে তাহার কোন আভাস সে পাইল না। সে কিন্তু নিঃশব্দচরণে আসিয়া অতি নিকটেই দাঁড়াইয়াছিল।

দ্বারপ্রান্তে শব্দ হইল। চঞ্চলা ফিরিয়া দেখিল, বৃদ্ধ ভৃত্য রামকান্ত দাঁড়াইয়া আছে।

"কি রামকু ?"

"ওনারা সব নীচে এসেছেন, কর্তাবাবু খবর দিতে বললেন।"

"আচ্ছা, যাচ্ছি আমি।"

রামকান্ত চলিয়া গেল। চঞ্চলা প্রস্তর-মূর্তিবৎ অনড় হইয়া দাঁড়াইয়া নিজের প্রতিবিম্বটার দিকে চাহিয়া রহিল। পুঞ্জীভূত যৌবনের অবরুদ্ধ আকুতি বিস্ফোরণের অপেক্ষায় যেন উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। "কর্তাবাবু খবর দিতে বললেন"—রামকুর কথাগুলা তাহার কানের আশেপাশে যেন গুঞ্জন করিতে লাগিল, সে গুঞ্জন ক্রমশ ব্যঙ্গে পরিণত হইল। বাবা কি

চান? সাধারণ পিতার মতো তিনি তো তাহার যথেচ্ছাচারে বাধা দেন না। বরং মনে হয়, কামনার নানা ইন্ধন জোগাইয়া দিয়া আকারে ইঙ্গিতে তিনি যেন বলেন—উপবাস করিও না, ভোগ কর। অথচ মুখে কিছু বলেন না। চূড়ামণি চৌধুরীকে যেদিন প্রথম তিনি সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন সেদিন তাঁহার চোখের দৃষ্টিতে একটা প্রচ্ছন্ন সকৌতুক-হাসি জ্বলজ্বল করিতেছিল। একজন ম্যাজিস্ট্রেটকে জামাই করিতে পারিলে বৈষয়িক নানারূপ সুবিধা হইবার সম্ভাবনা, তাই কি তিনি চূড়ামণি চৌধুরীকে প্রশ্রয় দিতেছেন? হয়তো তাই। চূড়ামণি চৌধুরীকে কেন্দ্র করিয়া প্রত্যহ নীচের ঘরে যে আড্ডা বসে তাহা ভদ্র হিন্দু গৃহস্থের বাড়িতে নিতান্তই অশোভন। কিন্তু এই অশোভন ব্যাপারকেও শক্তিধরবাবুর মতো দোর্দণ্ড-প্রতাপ সেকেলে জমিদার সহ্য করিতেছেন কেন? চঞ্চলা একটা গুজব শুনিয়াছিল। শক্তিধরবাবুর জমিদারীতে সম্প্রতি যে চাঞ্চল্যকর হত্যাকাণ্ড ঘটিয়াছে, তাহার সহিত শক্তিধরবাবু নাকি জড়িত। তাই কি তিনি একজন ম্যাজিস্ট্রেট-জামাইরূপ সরকারী পর্বতের অন্তরালে থাকিতে চান? এই জন্যই কি তাহাদের বাড়িতে প্রত্যহ আড্ডা বসিতেছে? শক্তিধরবাবু নিজে কিন্তু কোনদিন আড্ডায় যোগ দেন না। তিনি বাগানের পশ্চিম দিকের বাড়িটায় একা থাকেন। বন্ধু নিত্যনবীন ছাড়া অন্য কাহারও সেখানে প্রবেশাধিকার নাই। চঞ্চলার মা মারা যাইবার পর হইতে তিনি যেন আত্মসংবরণ করিয়াছেন। একটা দুর্দান্ত ঘোড়া উপল-বন্ধুর পথে ছুটিতে ছুটিতে হঠাৎ মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া গিয়াছে এ ধরণের উপমা শক্তিধরবাবুর সম্বন্ধে খাটে না। তিনি মুখ থুবড়াইয়া পড়েন নাই, স্বেচ্ছায় থামিয়া গিয়াছেন। সহস্রবিধ উৎসবের যিনি একদিন প্রধান নায়ক ছিলেন, তিনি স্বেচ্ছায় আত্মসম্বরণ করিয়াছেন। বাবার অতীত জীবন সম্বন্ধে চঞ্চলারও প্রত্যক্ষ কোন জ্ঞান নাই। সে ছেলেবেলা হইতেই বোর্ডিংএ বোর্ডিংএ মানুষ হইয়াছে। চঞ্চলার মা-ও সমস্ত জীবনটাই প্রায় বাপের বাড়িতে কাটাইয়াছেন। স্বামীর নিরতিশয় বস্তুতান্ত্রিক সান্নিধ্য তিনি সহ্য করিতে

পারিতেন না। শক্তিধরও ইহা লইয়া কোনও দিন জবরদস্তি করেন নাই। স্ত্রীর অভাবে তাঁহার জীবনও অচল হয় নাই কোনদিন। তিনি নিজের সৃষ্ট অলকাপুরীতে নিজের খেয়ালে বিবিধ উৎসবে মত্ত হইয়া রঙের নেশায় রসের সমুদ্রে জীবনটাকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করিয়া গিয়াছেন। অলকাপুরী এখনও ঠিক তেমনি আছে, তিনিই কেবল সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

ছুটির সময় চঞ্চলা মায়ের কাছে মামার বাড়িতে যাইত। বাবার সম্বন্ধে নানারূপ অদ্ভুত কথা শুনিত সে। শুনিয়াছিল, তিনি নাকি তান্ত্রিক হইয়াছেন। তাঁহাকে দেখিলে এখনও সে কথা মনে হয়। কপালে প্রকাণ্ড সিঁদুরের টিকা, গলায় রুদ্রাক্ষ স্কন্ধবিলম্বিত কৃষ্ণ কুঞ্চিত বাবরি, জ্বলন্তদৃষ্টি, খাঁড়ার মত নাক···চঞ্চলাব কেমন যেন ভয় হয়। সহসা তাহার মনে হইল, এই পিতার চক্রান্তে কোথায় চলিয়াছে সে? একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটকে বিবাহ করিলেই কি তাহার জীবন কৃতার্থ হইবে? তাহার শিক্ষা-দীক্ষা আশা-আকাঙ্ক্ষা কি ওই জন্যই? অনিমেষকে যাহা বলিয়া সেদিন সে প্রত্যাখ্যান কবিয়াছিল, তাই কি তাহা তাহার মনের কথা! ময়ূর-পঙ্খীর মত ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়ানোই কি তাহার জীবনের আদর্শ?···কবি শ্বেত-কমলের কথা মনে পড়িল। সেও হয়তো আজ আসিয়াছে। কি যে তাহার মনোভাব, চঞ্চলা বুঝিতে পারে না। দুর্বোধ্য কবিতা পড়িয়া শোনায় মাঝে মাঝে। কি তাহার অর্থ? আবার অনিমেষকে মনে পড়িল। মনে পড়িল, অভিমানী অনিমেষ আর আসিবে না। কলকণ্ঠের একটা উচ্চ হাস্য-রোল ভাসিয়া আসিল সহসা। নীচে তাহা হইলে আড্ডা বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। কিছুক্ষণ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল। নিজেকে কেমন যেন অসহায় বোধ হইতে লাগিল। মনে হইল, একটা ফাঁদে সে পা বাড়াইতেছে। ক্ষণকাল ইতস্তত করিল, তাহার পর ধীরে ধীরে নামিয়া গেল।

৩

কলকণ্ঠের হাসিটা শিখিনী চৌধুরীর। চূড়ামণি চৌধুরীর ভগিনী শিখিনী চৌধুরী ছুটিতে দাদার নিকট বেড়াইতে আসিয়াছেন এবং অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই বেশ জমাইয়া ফেলিয়াছেন। তিনি কোথায় নাকি শিক্ষয়িত্রীগিরি করেন। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে এমন কোনও কাজ নাই যাহা তিনি জানেন না। এখানে দোলের সময় প্রতিবৎসর একটা সভা হয়। এবার সেই উৎসবকে কেন্দ্র করিয়া শিখিনী চৌধুরী স্থানীয় মেয়েদের তালিম দিয়া একটা নাচের আয়োজন করিয়াছিলেন। কমিশনার সাহেবকে বিদায়-অভিনন্দন দিবার জন্য স্থানীয় ভদ্রলোকেরা—বিশেষ করিয়া অফিসার মহল, যে ভোজের আয়োজন করিয়াছিলেন তাহাতে দেশী বিদেশী সমস্ত প্রকার ভোজ্য বস্তু শিখিনী চৌধুরীর তত্ত্বাবধানেই প্রস্তুত হইয়াছিল। স্থানীয় পাঠাগারটিরও সংস্কার-সাধন তিনিই করিয়াছেন, নিজে গিয়া পুস্তকগুলির বিজ্ঞানসম্মত তালিকা প্রস্তুত করিয়া বইগুলি নিজের হাতে গুছাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার ফোটো তুলিবার শখ আছে, টিকিট সংগ্রহ করিবার বাতিক আছে, সাহিত্য-চর্চা করেন এবং এত সব করিবার পরও আড্ডা দিবার সময় পান। পিকনিকে অথবা শিকার পার্টিতে নিমন্ত্রিত হইলে কখনও নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন না, প্রতি সপ্তাহে অন্তত একবার সিনেমায় যাওয়া চাইই। গুজব, পিতামাতা তাঁহার নাম শিখণ্ডিনী রাখিয়াছিলেন, তিনি সে নাম বদলাইয়া শিখিনী হইয়াছেন। রূপসী নন, কিন্তু মনোহারিণী। এমন সর্বগুণান্বিতা শিখিনী চৌধুরীকে চঞ্চলার কিন্তু ভাল লাগে না। চঞ্চলা প্রবেশ করিয়াই দেখিতে পাইল, শিখিনী শ্বেতকমলের পাশের চেয়ারে বসিয়া আছেন। চঞ্চলাকে দেখিতে পাইবামাত্র বলিয়া উঠিলেন, "শোন চঞ্চলা, শ্বেতকমলবাবু ভারি অদ্ভুত কথা বলেছেন একটা—"

"কি কথা ?"

সকলের সান্নিধ্য এড়াইয়া চঞ্চলা একটু দূরে গিয়া বসিল।

"উনি বলছেন, ভাবের বাহন হিসেবে প্রচলিত কথাগুলো বড় একঘেয়ে হয়ে এসেছে। শুধু একঘেয়ে নয়—অযোগ্য, অপটু। ওঁর মতে ভাবের উপযোগী নূতন নূতন কথা স্মৃষ্টি করা উচিত। যেমন, মনিবো, আগহু, ইবাবিলা—"

শিখিনী চৌধুরী হাসিয়া ফেলিলেন। কবি শ্বেতকমলের মুখটা লজ্জায় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি উঠিয়া পড়িলেন, চঞ্চলার সম্মুখে বসিয়া থাকা অসম্ভব হইয়া উঠিল তাঁহার পক্ষে। উঠিয়া তিনি হলের পূর্বপ্রান্তের খোলা জানালাটার সম্মুখে গিয়া সকলের দিকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

শিখিনী চৌধুরী চঞ্চলার দিকে চাহিয়া বাম চক্ষুটি কুঞ্চিত করিলেন একবার। তাহার পর নিম্নকণ্ঠে বলিলেন, "কবির রাগ হল। আর একটা উচ্চাঙ্গের কবিতা পাব বোধ হয় অনবা—"

চঞ্চলা মুচকি হাসিল একটু। কিন্তু তাহার মনে হইতে লাগিল একটা অদৃশ্য কারাগার যেন ধীরে ধীরে তাহার চারিদিকে মূর্ত হইতেছে।

"তোমাকে আজ গান গাইতে হবে একটা।"

"গলাটা আজ ভাল নয়—"

"সে সব শুনছি না। রবীন্দ্র-সঙ্গীত একখানা, গজল একখানা, আর আধুনিক সঙ্গীত একখানা। এই তিনটে গেয়েই তোমার ছুটি আজ।"

একবার গলা-খাঁকরি দিয়া চঞ্চলা পুনরায় বলিল, "গলাটা কেমন যেন ব্যথা ব্যথা করছে কাল থেকে"

"গান গাইলেই সেরে যায় ওসব ব্যথা। গান-প্রসবের ব্যথা ওসব।"

শিখিনী চৌধুরীর নয়নে অপূর্ব একটা বিদ্যুৎ-ঝিলিক মূর্ত হইয়া উঠিল।

চূড়ামণি চৌধুরী এক কোণে একটা ইজিচেয়ারে শুইয়া সেদিনকার কাগজখানা পড়িতেছিলেন। তিনি আড়চোখে একবার শ্বেতকমলের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। তাঁহার অজ্ঞাতসারেই অতর্কিতে তাঁহার মুখ দিয়া

বাহির হইয়া পড়িল—"বাই জোভ!" তাহার পর হাসিভরা চোখে তিনি চঞ্চলার দিকে চাহিলেন একবার। প্রতিমার মতো বসিয়া আছে। মুখে কোনও ভাবান্তর ঘটিতেছে না, চোখের পলক পর্যন্ত পড়িতেছে না। হঠাৎ চূড়ামণি চৌধুরীর নজরে পড়িল, চঞ্চলা তাঁহার দেওয়া ঢাকাই শাড়িখানাই পরিয়া বসিয়াছে। সমস্ত মন কেমন যেন অনবদ্য অপূর্ব রসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। মনে হইল, ওই তুচ্ছ শাড়িখানার মাধ্যমে সে যেন চঞ্চলার অন্তরলোকের অতি কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মনে হইল, চঞ্চলা কতদূরে···শাড়িখানা যেন তাহাকে আড়ালই করিয়া ফেলিয়াছে। আবার তিনি খবরের কাগজে মন দিলেন। ঠিক কাগজে মন দিলেন না, কাগজটা মুখের সামনে ধরিয়া নিজের চিত্ত-বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার সম্বন্ধে চঞ্চলার কোনও উল্লাস বা উচ্ছ্বাস লক্ষ্য না করিয়া তিনি যেন একটু অপমানিতই বোধ করিতেছিলেন। চঞ্চলাকে দেখিয়া তাঁহার ভাল লাগিয়াছে, চঞ্চলাকে পত্নীত্বে বরণ করিতেও তাঁহার আপত্তি নাই, কিন্তু চঞ্চলার ব্যবহার বড় বিচিত্র। তাঁহাকে যেন আমলই দিতেছে না। আশ্চর্য, কিন্তু কেন···

অনেক দিন আগে চঞ্চলা ইবসেনের 'ডল্‌স্ হাউস্' পড়িয়াছিল—অন্যমনস্ক হইয়া সেই কথাই সে ভাবিতেছিল।

"নমস্কার—নমস্কার—"

হাস্য বিকিরণ করিতে করিতে মিসেস মৈত্র—মিসেস ললি মৈত্র প্রবেশ করিলেন। চোখে কাজল, মুখে গলায় পাউডারের পালিশ, গালে ঠোঁটে লাল রঙ, কুচকুচে কালো রঙের ব্লাউসে চুমকির ঝিকিমিকি, মাথার সামনের দিকের চুল ফাঁপানো, কানে সবুজ পাথর-বসানো টাপ—কে বলিবে ভদ্র-মহিলার বয়স চল্লিশ পার হইয়া গিয়াছে! পরণে যে সাদা সিল্কের শাড়ি রহিয়াছে তাহা পাড়হীন, সীমন্তে সিঁদুর নাই। অথচ তিনি হিন্দু এবং মিস্টার মৈত্র প্রবলভাবে জীবিত। মিস্টার বিজয়কুমার মৈত্র শুধু জীবিত

নন, শহরের বেশ গণ্যমান্য ভদ্রলোক, নাম-করা উকীল একজন। তিনি তাঁহার পত্নীর এই সব বিসদৃশ আচরণের কোনও প্রতিবাদ কখনও করিয়াছেন কি না, তাহা জানা যায় নাই। প্রকাশ্যে বরং দেখা যায় পত্নীর সম্বন্ধে যখনই তিনি কোন উল্লেখ করেন, তখন বেশ সম্ভ্রমসূচক বাক্যাবলীই ব্যবহার করেন। 'উনি অমুক কাজটা করতে ভালবাসেন', 'ওঁর এই মত'—এই ধবণের কথা শুনিয়া মনে হয় যে, পত্নীকে উনি সম্ভবত শ্রদ্ধাই করেন। বলা বাহুল্য, ললি মৈত্রকে কেন্দ্র করিয়া নানাবিধ গুজব নানা কণ্ঠে নানা সুরে সর্বদাই পল্লবিত হয়। তিনি এসব গ্রাহ্য করেন না—এ কথা বলিলে ভুল হইবে। তাঁহার সম্বন্ধে কে কি বলিতেছে। তাহার প্রত্যেক খবরটি তিনি সংগ্রহ করেন এবং সংগ্রহ করিবার পর বাড়াবাড়ি মাত্রাটা আরও বাড়াইযা দেন। গালের এবং ঠোঁটের রঙ আরও প্রকট হইয়া উঠে, ব্লাউসের গলাটা আবও খুলিয়া যায়, অবগুণ্ঠন সরাইয়া মাথার চুলটা আরও বে-পবোয়াভাবে আলুলায়িত কবিযা দেন। অর্থাৎ গুজবপরায়ণ সমালোচকদেব নাকের সম্মুখে দুইটি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ নাড়িয়া যেন বলিয়া দেন—বেশ করিতেছি আবও করিব। মিসেস ললি মৈত্রের সঙ্গে আসিযাছিলেন তাঁহাব আধুনিকতম পুরুষ বন্ধু, মিস্টার পুরী। তিনিও একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। শুধু তাই নয়, তিনি একজন সুদক্ষ তবলা-বাদকও। মিস্টার পুরী স্মিতমুখে সকলকে নমস্কাব করিয়া একটি আসন গ্রহণ করিলেন।

"চঞ্চলা, তোমাকে আজ সেই কথ্থক নাচটা নাচতে হবে, মিস্টার পুরী বাজাবেন। মিস্টার চৌধুরীর নিশ্চয় আপত্তি নেই এতে—"

"না না, আমার আপত্তি থাকবে কেন—"

"বাস, তাহ'লে আর তোমার ভয় কি চঞ্চলা!"

চঞ্চলা মৃদুকণ্ঠে বলিল, "শরীরটা ভাল নেই আজ।"

"তাই না কি, কি হয়েছে?"

চূড়ামণি চৌধুরীর কণ্ঠস্বরে একটা আকুলতার সুর বাজিয়া উঠিল। চোখ তুলিয়া চাহিতেই পিতার সহিত চোখাচোখি হইয়া গেল চঞ্চলার।

পশ্চিম দিকের বারান্দায় স্থিরদৃষ্টিতে তিনি তাহার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাঁহার দৃষ্টিতে একটা মৌন ভৎ'সনা মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সে দৃষ্টি যেন বলিতেছিল - এ তোমার কেমন ব্যবহার! চঞ্চলা দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল।

শিখিনী চৌধুরী বলিলেন, "আগে গান হয়ে যাক একটা। তার পর নাচ হবে।"

"বেশ। অ্যাট্‌মস্‌ফিয়ারটা নাচের উপযোগী হয়ে উঠবে বরং তাতে।"

রামকান্ত চা ও খাবারের সরঞ্জাম লইয়া প্রবেশ করিল।

"রামকান্ত, তুমি ডুগি তবলা আর তানপুরাটা পাঠিয়ে দাও তো। হার্মোনিয়মটাও।" - শিখিনী বলিলেন।

মিস্টার পুরী হাতুড়ি ঠুকিয়া তবলা বাঁধিতেছিলেন। ললি মৈত্র হার্মোনিয়মে সুর দিতেছিলেন। চূড়ামণি চৌধুরী খবরের কাগজ ছাড়িয়া চঞ্চলার খুব কাছে আসিয়া বসিয়া ছিলেন। শ্বেতকমলও আর বাতায়নে দাঁড়াইয়াছিলেন না। বাতায়ন-পথে বাগানের পুষ্করিণীটার যে রূপ তিনি দেখিয়াছিলেন এবং তাহার সহিত চঞ্চলার যে সম্পর্ক তাঁহার কবিমানসে প্রতিভাত হইয়াছিল তাহাই অন্যমনস্ক করিয়া রাখিয়াছিল তাঁহাকে। তিনি অন্যমনস্ক হইয়া নির্নিমেষে চঞ্চলার মুখের দিকেই চাহিয়াছিলেন। শক্তিধরবাবু পশ্চিমের বারান্দায় প্রত্যক্ষভাবে ছিলেন না। কিন্তু তাঁহার দৃষ্টিটা চঞ্চলার হৃদয়ে শায়কের মত বিঁধিয়া ছিল।

নতনেত্রে বসিয়াছিল চঞ্চলা। জীবন সাগরের তরঙ্গশীর্ষে ময়ূরপঙ্খীর মত ভাসিয়া বেড়াইবার যে কল্পনাটা তাহার মনে কিছুক্ষণ আগেও নেশা ধরাইয়া দিয়াছিল তাহার বর্ণচ্ছটা সহসা যেন মশালের আলোকে রূপান্তরিত হইয়া ঘিরিয়া ধরিয়াছিল তাহাকে। তাহার মনে হইতেছিল, শিকারীর দল তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে, উদ্ধারের আর উপায় নাই, বাবাও উহাদের দলে।

"চঞ্চু, আরম্ভ ক'রে দাও, আর দেরি করছ কেন? আমাকে নটার সময় প্রিন্সিপালের বাড়ি যেতে হবে আবার—"

শিখিনী চৌধুরী তাঁহার সুদৃশ্য সোনার হাতঘড়িটির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। মিস্টার পুরীর অঙ্গুলিগুলি তবলার উপরে অধীর আগ্রহে বোল তুলিতে লাগিল।

"আর দেরি নয়, আরম্ভ কর, আরম্ভ কর—"

চঞ্চলা নতনেত্রে বসিয়াছিল। ভাবিতেছিল, যে পাপ সে করিয়াছে তাহার শাস্তি আসন্ন, নরককুণ্ডে লাফাইয়া পড়িতেই হইবে, কিন্তু—

"চঞ্চলা এখানে আছে—?"

সকলে চাহিয়া দেখিলেন দ্বারপ্রান্তে অধ্যাপক অনিমেষ ঘোষাল দাঁড়াইয়া আছেন। চঞ্চলা দাঁড়াইয়া উঠিয়া ছিল।

"আমাকে ডাকছেন?"

"হ্যাঁ। শোন, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে—"

চঞ্চলা বাহির হইয়া গেল। আর ফিরিল না।

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা হইতে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে
শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও ৪, সিমলাষ্ট্রীট্, কলিকাতা,
শৈলেন প্রেস হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

বাহির হইয়া পড়িল—"বাই জোভ!" তাহার পর হাসিভরা চোখে তিনি চঞ্চলার দিকে চাহিলেন একবার। প্রতিমার মতো বসিয়া আছে। মুখে কোনও ভাবান্তর ঘটিতেছে না, চোখের পলক পর্যন্ত পড়িতেছে না। হঠাৎ চূড়ামণি চৌধুরীর নজরে পড়িল, চঞ্চলা তাঁহার দেওয়া ঢাকাই শাড়িখানাই পরিয়া রহিয়াছে। সমস্ত মন কেমন যেন অনবদ্য অপূর্ব রসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। মনে হইল, ওই তুচ্ছ শাড়িখানার মাধ্যমে সে যেন চঞ্চলার অন্তরলোকের অতি কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মনে হইল, চঞ্চলা কতদূরে···শাড়িখানা যেন তাহাকে আড়ালই করিয়া ফেলিয়াছে। আবার তিনি খবরের কাগজে মন দিলেন। ঠিক কাগজে মন দিলেন না, কাগজটা মুখের সামনে ধরিয়া নিজের চিত্ত-বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার সম্বন্ধে চঞ্চলার কোনও উল্লাস বা উচ্ছ্বাস লক্ষ্য না করিয়া তিনি যেন একটু অপমানিতই বোধ করিতেছিলেন। চঞ্চলাকে দেখিয়া তাঁহার ভাল লাগিয়াছে, চঞ্চলাকে পত্নীত্বে বরণ করিতেও তাঁহার আপত্তি নাই, কিন্তু চঞ্চলার ব্যবহার বড় বিচিত্র। তাঁহাকে যেন আমলই দিতেছে না। আশ্চর্য, কিন্তু কেন···

অনেক দিন আগে চঞ্চলা ইবসেনের 'ডল্‌স্ হাউস্' পড়িয়াছিল—অন্যমনস্ক হইয়া সেই কথাই সে ভাবিতেছিল।

"নমস্কার—নমস্কার—"

হাস্য বিকিরণ করিতে করিতে মিসেস মৈত্র—মিসেস ললি মৈত্র প্রবেশ করিলেন। চোখে কাজল, মুখে গলায় পাউডারের পালিশ, গালে ঠোঁটে লাল রঙ, কুচকুচে কালো রঙের ব্লাউসে চুমকির ঝিকিমিকি, মাথার সামনের দিকের চুল ফাঁপানো, কানে সবুজ পাথর বসানো টাপ—কে বলিবে ভদ্রমহিলার বয়স চল্লিশ পার হইয়া গিয়াছে! পরণে যে সাদা সিল্কের শাড়ি রহিয়াছে তাহা পাড়হীন, সীমন্তে সিঁদুর নাই। অথচ তিনি হিন্দু এবং মিস্টার মৈত্র প্রবলভাবে জীবিত। মিস্টার বিজয়কুমার মৈত্র শুধু জীবিত

নন, শহরের বেশ গণ্যমান্ত ভদ্রলোক, নাম-করা উকীল একজন। তিনি তাঁহার পত্নীর এই সব বিসদৃশ আচরণের কোনও প্রতিবাদ কখনও করিয়াছেন কি না, তাহা জানা যায় নাই। প্রকাশ্যে বরং দেখা যায় পত্নীর সম্বন্ধে যখনই তিনি কোন উল্লেখ করেন, তখন বেশ সম্ভ্রমসূচক বাক্যাবলীই ব্যবহার করেন। 'উনি অমুক কাজটা করতে ভালবাসেন', 'ওঁর এই মত'—এই ধরণের কথা শুনিয়া মনে হয় যে, পত্নীকে উনি সম্ভবত শ্রদ্ধাই করেন। বলা বাহুল্য, ললি মৈত্রকে কেন্দ্র করিয়া নানাবিধ গুজব নানা কণ্ঠে নানা সুরে সর্বদাই পল্লবিত হয়। তিনি এসব গ্রাহ্য করেন না—এ কথা বলিলে ভুল হইবে। তাঁগাব সম্বন্ধে কে কি বলিতেছে। তাহার প্রত্যেক খবরটি তিনি সংগ্রহ করেন এবং সংগ্রহ করিবার পর বাড়াবাড়ি মাত্রাটা আরও বাড়াইযা দেন। গালেব এবং ঠোঁটের রঙ আরও প্রকট হইয়া উঠে, ব্লাউসেব গলাটা আরও খুলিয়া যায়, অবগুণ্ঠন সরাইয়া মাথার চুলটা আরও বে-পরোযাভাবে আলুলায়িত করিয়া দেন। অর্থাৎ গুজবপরায়ণ সমালোচকদের নাকের সম্মুখে দুইটি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ নাড়িয়া যেন বলিয়া দেন—বেশ করিতেছি আরও করিব। মিসেস ললি মৈত্রের সঙ্গে আসিয়াছিলেন তাঁহার আধুনিকতম পুরুষ বন্ধু, মিস্টার পুরী। তিনিও একজন উচ্চপদস্থ কর্মচাবী। শুধু তাই নয়, তিনি একজন সুদক্ষ।তবলা-বাদকও। মিস্টার পুরী স্মিতমুখে সকলকে নমস্কার করিয়া একটি আসন গ্রহণ করিলেন।

"চঞ্চলা, তোমাকে আজ সেই কথ্থক নাচটা নাচতে হবে, মিস্টাব পুরী বাজাবেন। মিস্টার চৌধুরীর নিশ্চয় আপত্তি নেই এতে—"

"না না, আমার আপত্তি থাকবে কেন—"

"বাস, তাহ'লে আর তোমার ভয় কি চঞ্চলা!"

চঞ্চলা মৃদুকণ্ঠে বলিল, "শরীরটা ভাল নেই আজ।"

"তাই না কি, কি হয়েছে?"

চূড়ামণি চৌধুরীর কণ্ঠস্বরে একটা আকুলতার সুর বাজিয়া উঠিল। চোখ তুলিয়া চাহিতেই পিতার সহিত চোখাচোখি হইয়া গেল চঞ্চলার।

পশ্চিম দিকের বারান্দায় স্থিরদৃষ্টিতে তিনি তাহার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাঁহার দৃষ্টিতে একটা মৌন ভর্ৎসনা মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সে দৃষ্টি যেন বলিতেছিল—এ তোমার কেমন ব্যবহার! চঞ্চলা দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল।

শিখিনী চৌধুরী বলিলেন, "আগে গান হয়ে যাক একটা। তার পর নাচ হবে।"

"বেশ। অ্যাট্‌মস্‌ফিয়ারটা নাচের উপযোগী হয়ে উঠবে বরং তাতে।"

রামকান্ত চা ও খাবারের সরঞ্জাম লইয়া প্রবেশ করিল।

"রামকান্ত, তুমি ডুগি তবলা আর তানপুরাটা পাঠিয়ে দাও তো। হার্মোনিয়মটাও।"—শিখিনী বলিলেন।

মিস্টার পুরী হাতুড়ি ঠুকিয়া তবলা বাঁধিতেছিলেন। ললি মৈত্র হার্মোনিয়মে সুর দিতেছিলেন। চূড়ামণি চৌধুরী খবরের কাগজ ছাড়িয়া চঞ্চলার খুব কাছে আসিয়া বসিয়া ছিলেন। শ্বেতকমলও আর বাতায়নে দাঁড়াইয়াছিলেন না। বাতায়ন-পথে বাগানের পুষ্করিণীটার যে রূপ তিনি দেখিয়াছিলেন এবং তাহার সহিত চঞ্চলার যে সম্পর্ক তাঁহার কবিমানসে প্রতিভাত হইয়াছিল তাহাই অন্যমনস্ক করিয়া রাখিয়াছিল তাঁহাকে। তিনি অন্যমনস্ক হইয়া নির্নিমেষে চঞ্চলার মুখের দিকেই চাহিয়াছিলেন। শক্তিধরবাবু পশ্চিমের বারান্দায় প্রত্যক্ষভাবে ছিলেন না। কিন্তু তাঁহার দৃষ্টিটা চঞ্চলার হৃদয়ে শায়কের মত বিঁধিয়া ছিল।

নতনেত্রে বসিয়াছিল চঞ্চলা। জীবন-সাগরের তরঙ্গশীর্ষে ময়ূরপঙ্খীর মত ভাসিয়া বেড়াইবার যে কল্পনাটা তাহার মনে কিছুক্ষণ আগেও নেশা ধরাইয়া দিয়াছিল তাহার বর্ণচ্ছটা সহসা যেন মশালের আলোকে রূপান্তরিত হইয়া ঘিরিয়া ধরিয়াছিল তাহাকে। তাহার মনে হইতেছিল, শিকারীর দল তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে, উদ্ধারের আর উপায় নাই, বাবাও উহাদের দলে।

"চঞ্চু, আরম্ভ ক'রে দাও, আর দেরি করছ কেন? আমাকে নটার সময় প্রিন্সিপালের বাড়ি যেতে হবে আবার—"

শিখিনী চৌধুরী তাঁহার সুদৃশ্য সোনার হাতঘড়িটির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। মিস্টার পুরীর অঙ্গুলিগুলি তবলার উপরে অধীর আগ্রহে বোল তুলিতে লাগিল।

"আর দেরি নয়, আরম্ভ কর, আরম্ভ কর—"

চঞ্চলা নতনেত্রে বসিয়াছিল। ভাবিতেছিল, যে পাপ সে করিয়াছে তাহার শাস্তি আসন্ন, নরককুণ্ডে লাফাইয়া পড়িতেই হইবে, কিন্তু—

"চঞ্চলা এখানে আছে—?"

সকলে চাহিয়া দেখিলেন দ্বারপ্রান্তে অধ্যাপক অনিমেষ ঘোষাল দাঁড়াইয়া আছেন। চঞ্চলা দাঁড়াইয়া উঠিয়া ছিল!

"আমাকে ডাকছেন?"

"হ্যাঁ। শোন, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে—"

চঞ্চলা বাহির হইয়া গেল। আর ফিরিল না।

— —

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা হইতে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে
শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও ৪, সিমলাষ্ট্রীট্, কলিকাতা,
শৈলেন প্রেস হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত।